

— শুচি-শুদ্ধ সজীব পল্লী-চিত্র —

পল্লী-লক্ষ্মী

‘এসো সোনার বরণী রাণী গো, শঙ্খ-কমল করে,
এসো মা লক্ষ্মী, ব’সো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।’



তৃতীয় সংস্করণ

১৩৩৪

কাব্যানন্দ—

ব্রাহ্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭ এক টাকা

সর্বস্বাধীন ও আলোক-চিত্রাভিনয়-বহু প্রকাশকের।

— প্রকাশক —
শ্রীকিরীটকুমার পাল,
শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত ।

নিম্মল-সাহিত্য-পীঠ
২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, (ঠান্ডেনে কালীতলা)
কলিকাতা।

—আগামী সংখ্যার নূতন উপন্যাস—
গোলাপ-গন্ধামোদিত-উপন্যাস-সাহিত্যের—নূতন ধারা

অঙ্কলক্ষ্মী

‘গোলাপ সুন্দরতম, ফুটো-ফুটো করে যবে ধীরে,
আশা সমুজ্জলতম, ভীতি হ’তে মুক্তি যবে তার;
গোলাপ মধুরতম, সিক্ত যবে প্রভাত-শিশিরে;
প্রেমিকা সুন্দরীতমা, নেত্রে যবে বহে অশ্রুধার !

ধন্য প্রস্তুকার!—ধন্য সুবিচার!—

কৌশলের বাকী কোথা আর ?

প্রতি পত্রাঙ্কে—প্রত্যেক রেখাপাতে—আগ্নেরগিরির অগ্নুৎপাত !

— অঙ্কলক্ষ্মী —

এ বৎসরে প্রকাশিত ১,০০০ উপন্যাস অপেক্ষা অধিক !

ইহাতেই আছে, যামিনীবাবুর চিত্তমকগ্রদ চিত্র-বৈচিত্র্যের বর্ণবৈশিষ্ট্য ।

আনন্দময়ী-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস
কলিকাতা—১ নং নিমতলা ঘাট স্ট্রীট হইতে
শ্রীচুনিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ।



.....এতবড় খাটবুড়ো ঝি.....

বিবাহ না দিলে পরে লোকে করে কি ? (পৃষ্ঠা)

ঐতি উপহার



৭



— রেল ওয়ে সিরিজ —

— অতঃপর —

প্রকাশিত হইতেছে

‘বসুমতীর’—সম্পাদক-চাণক্য

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

ডেরা-বালি

চিত্রশিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার ইত্যাদি

* কিম্বাশ্চর্য্য অতঃপরম্! *

পল্লী-লক্ষ্মী

(ধর্ম-উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোপাল এক মনে অনেকক্ষণ গীতা পাঠ করিল, পড়িতে পড়িতে গোলমাল বোধ হইল। সে আপন মনে কহিল, ‘ভগবানের কথায় তো ভ্রম-বিরুদ্ধবাদ থাক্বে না ; গীতায় যে আগা গোড়া বিরুদ্ধ কথা।’ এই বলিয়া গোপাল অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিল—আবার একমনে গীতা পড়িতে লাগিল—গীতা ছাড়িয়া আবার ভাবিতে লাগিল। সে একবার পড়ে—একবার ভাবে, আবার পড়ে—আবার ভাবে। অবশেষে উচ্চকণ্ঠে কহিল, ‘না, এ কিছু বুঝবার যো নাই। এই কি ভগবানের বাক্য ! তাই তো, এতে ধর্মের কথা তো. কিছুই বুঝলেন না। মানব-জীবনে ধর্মটা যদি না বুঝলেন তবে আর বুঝলেন কি, আর জীবনটাই বা কেন ?

মানব-জীবনে আর কীট পতঙ্গের জীবনে প্রভেদ রইল কি ?' একটু পরে প্রবোধ আসিয়া কহিল, 'এতো ভাবছ কি ? ধর্মের কথা ভেবে ভেবে তুমি দেখছি মাথা খারাপ করে ফেলবে ।'

গোপাল হাসিয়া কহিল, 'ধর্মের কথা ভাবলে যে মাথা খারাপ হয়, সে মাথায় দরকার কি ! ধর্মের কথা ভাববার জন্তই তো মানুষের মাথা ।'

প্রবোধ কহিল, 'পরমহংসদেব তাই বলতেন । আর পণ্ডিত শাস্ত্রী ঠিক ঐ উত্তরই দিচ্ছেলেন । শাস্ত্রী বলেন—ভগবানের কথা বেশী ভাবলে মাথা খারাপ হয় ।'

গোপাল কহিল, 'তা হয় হোক । সার সত্য ছেড়ে অসার অসত্য ভাবতে পারি না ।'

প্রবোধ সদর্পে কহিল, 'যদি ভগবানকে সার সত্য বলে বুঝে থাক, তবে তাঁর তৈরি সংসার-সমাজকেও সার সত্য বলে ধরো না কেন ? সে গুলো তো প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষকে ধরে কাজ করে যাও ।'

গোপাল কহিল, 'কোমট তাই ধরে পজিটিভিজমের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গাঁথতে চেষ্টা করেছিলেন । শেষটা ভেঙে পড়ে গেল ।

প্রবোধ... ভাঙলো কেন ?

গোপাল... বনেন্দ কাঁচা ছিল বলে । গোড়ায় ভগবানকে না ধরলে, কিছু গাঁথা যায় না ।

প্রবোধ... প্রকৃতিকে ধরেই ধর্মের সিঁড়িতে উঠতে হয়,

সোল এজেন্ট— কমলিনী-সাহিত্য মন্দির

আমাদের পক্ষে এখন সেইটাই পথ। দেশ-মাতৃকাই এখন আমাদের প্রকৃতি—জননী জগদ্ধাত্রী।

গোপাল...কেবল কাব্য-কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, মাথা মানতে চায় না।

প্রবোধ...মাথা প্রাণকে জোর করে মানিয়ে নিতে হবে।

দেহের জড়তা ভাঙ্গিয়া গোপাল কহিল, 'দেখা যাক্। তুমি তো একজন বড় ডাক্তার; তোনার হাতে পড়িছি কোথায় গিয়ে দাড়াই। তুমি ক'লকাতা যাচ্ছ কবে?'

প্রবোধ...আজই, একটু পরেই। উঠি, আমার বেলা হ'লো। চিঠি লিখলে জবাব দিও। ছেলেগুলোকে নিয়ে, পুকুরটা বাতে পরিকার হয় তার বিশেষ চেষ্টা ক'রো, পচা পাতা আর পানায় পুরে আছে—ঐটাই পীরে ম্যালেরিয়ার গোড়া।

গোপাল কহিল, 'পী ত' মরেই গেছে আর ম্যালেরিয়ার করবে কি?'

প্রবোধ...না না, এখনও গ্রামটা সম্পূর্ণ মরেনি, এখনও চেষ্টা কল্পে বাঁচতে পারে। গা বাঁচাতে গেলে আগে ম্যালেরিয়াকে তাড়াতে হবে—কেরোসিনে মশার বনেদ মারতে হবে।

গোপাল...ও থিওরিটা আমার বড় ভাল লাগে না।

প্রবোধ উঠিয়া কহিল, 'যাক্ সে তর্কের সময় এখন আমার নেই দাদা, আমি চলেম। বৌদিদিকে আমার নমস্কার দিও। ব'লো, তাড়াতাড়িতে এবারে তাঁর পানের ধুলো নিতে পায়েম না।'

নিদাধের নবীন নীরদের স্নায় শান্তি-বারি বক্ষে করিয়া
মৃদু-মধুর হাস্যময়ী নয়নবৌ আসিয়া উভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল।
প্রবোধ তাড়াতাড়ি বৌদিদির পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

নয়নবৌ ব্যস্তভাবে প্রবোধকে বাধা দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,
‘ওকি, ওকি ঠাকুরপো, আমার পায়ের ধূলা তুমি নেবে!’

প্রবোধ অশ্রুট স্বরে কহিল, ‘তোমার মত সতী সাবিত্রীর পায়ের
ধূলায় ধরা ধস্ত হয়, আমি তো কোন ছার!’ প্রকাশ্যে কহিল,
‘শুধু পায়ের ধূলায় তো পেট ভরবে না, ঘরে খাবার কিছু আছে
তো দাও, অনেকদিন তোমার হাতে কিছু খাইনি। মা মরে
অবধি তোমার হাতে ছাড়া মিষ্টি জিনিষ আর ছুনিয়ার কোথাও
খাইনি বৌদি।’ মনে মনে কহিল, ‘সত্যই তুমি অমৃতময়ী—
অমৃত-রূপিণী। যেমন দেবতা—তেমন দেবী। মণি-কাঞ্চন
সংযোগ—হরগৌরী মিলন। ধন্ত গোপালদা, ধন্ত তোমার
জীবন! আর ধন্ত তুমি দেবী, ধন্ত তোমার ধরায় অবতরণ।’

নয়ন কহিল, ‘ঠাকুরপো, আমার রান্না হয়েছে, লীগ্‌গির
স্নান ক’রে দু’টো খেয়ে যাও। অনেকদিন তোমাদের দুই
ভাইকে একসঙ্গে খাওয়াইনি। তবে তরকারি-পাতি তেমন
নেই ভাই, দেখছ-ইতো গাঁয়ের দশা। কিছু কি কিনবার যো
আছে আর।’

গোপাল সহাস্ত্রে কহিল, ‘তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরণ থাক্তে
গাঁয়ের দশা যে কেন এমন হলো বৌদি, কিছুই বুঝতে পারি না।
সবই আমাদের ভাগ্য।’

নয়নবো ভীতকণ্ঠে কহিল, ‘তাইতো ঠাকুরপো, লোকপুর এমন সোণার গাঁ, পৃথিবীর মধ্যে যেন ইন্দুরী, তার এমন দশা! বেশী দিনের কথা নয়—পাঁচ সাত বছরের মধ্যে কেন এমন হলো ঠাকুরপো? কথায় বলে, ‘রেতে কা-কা, দিবা শিবা’ রেতে কাকের ডাক আর দিনে শিয়ালের ডাক যে গাঁয়ের গ্রহরী, সে গাঁ সত্তর অশান হয়ে পড়ে—সে গাঁয়ে বাস করতে নেই।’

প্রবোধ সজোরে কহিল, ‘তুমি কল্যাণময়ী পল্লী-লক্ষ্মী। তুমি থাকতে গাঁ কখন মরবে না—লোকপুর আবার লোকে ভরপুর হবে। লোকপুর আমাদের জন্মভূমি—আবার লোকপুর বাঁচবে—আবার জাগবে—আবার ধন-ধান্তে পূর্ণ হবে।’

বিবল বদনে নয়নবো কহিল, ‘তা তো হবে, কিন্তু তোমরা গাঁ ছেড়ে গেলে লোকপুরকে কে বাঁচাবে—কে জাগাবে? যে ক’টা লোক গাঁয়ে আছে, তারা কতকগুলো মরা, বাকিগুলো শিয়াল কুকুর। যদি গাঁকে বাঁচাতে চাও, তোমরা কজন গাঁয়ের ছেলে বিদেশ ছেড়ে দেশে এসো। জীবন্ত মানুষ যে ক’জন, তারা টাকার লোভে—আপনার স্বার্থ, সুখের লোভে—বিদেশে বাস করলে গাঁ কখনও বাঁচবে না। দূর থেকে মুখের চীৎকার কলে মরা দেশ জাগবেও না—বাঁচবেও না। গাঁয়ে ঘরে এসে দেশের জন্ত হাতে-কলমে কাজ করতে হবে, কাজ করাতে হবে। খালি মুখে ‘ম্যালেরিয়া’ ম্যালেরিয়া’ করলে কোন ফল ফলবে না।’

প্রবোধ কহিল, ‘তা বটে বোধি। প্রাণে শক্তি নেই, তাই প্রাণের কান্না মুখে কাঁদি। মহাশত্রু ‘ম্যালেরিয়াই-তো দেশটাকে খেলে। তাকে কি ক’রে মারি, সেই চিন্তায় পাগলের মত পথে ঘাটে কাঁদি! জেগে কাঁদি—ঘুমিয়ে কাঁদি—দেশে কাঁদি—বিদেশেও কাঁদি।’

নয়ন কহিল, কেবল এক ম্যালেরিয়াকে মারলে হবে না ঠাকুরপো। জঙ্গল সাফ করে—এঁদো ডোবা ভরাট করে, পেকো-পুকুর পরিষ্কার করে, মশা ঘেরে যেমন ম্যালেরিয়ার বীজ মারতে হবে, তেমনি আর একটা বড় শত্রুর জড়কেও মারতে হবে।’

প্রবোধ...আর তেমন বড় শত্রু কি বোধি?

নয়ন...সব চেয়ে বড় শত্রু অনাহার। দুর্বল দেহের ঘাড়েই ম্যালেরিয়ার বেশী অধিকার, অনাহারের গোড়া হচ্ছে পরসার অভাব। দেশের যে দশা দাঁড়িয়েছে, তাতে গোলামীতে আর পরসা হচ্ছে না। দেখতেই পাচ্ছ, বি-এ এম-এ পাশ ক’রে পঁচিশ ত্রিশ টাকা চাকরী মিলছে না। পাশ করাতে বে খরচ হয়, তাতে ছেলেকে ব্যবসা করবার পুঁজি বেশ করে দেওয়া যায়—এ মোটা কথাটা এখন খুব মোটা বুদ্ধির লোকেও বুঝতে শিখেছে। জিনিস পত্রের যে দাম চড়েছে, তাতে আগেকার চার পাঁচ গুণ খরচে এখন অতি কষ্টে ভাত কাপড়টা মেলে। তার উপর একটা মহাগ্রহ—মেয়ে। তার বিয়ে, বেহাই বেহানের বাড়ী তত্ত্ব-তল্লাস, তার ওপর উপগ্রহ—ভাক্তার

সোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

কুইনাইন, সাণ্ড, বেদানা। এ সব ছাড়া নিত্য দৈবসেবা—
চা বিস্কুট পান সিগারেট ইত্যাদি উপকরণ আছে, সকলের
ওপর উপসর্গ—ঘড়ি, ছড়ি, জামা, জুতা ইত্যাদি ইত্যাদি।
এই সকলের ওপর আবার বকমারি ভোগবিলাস আছে—
অন্ধরে, বাইরে, কাণে নাম শুনেছি, চোখেও দেখিনি—
মনেও রাখতে পারিনি। নানারকমের নানা উপদ্রবে এখন
এ দেশের জীবনটা এতো ভারী—এতো বিড়ম্বনার বোঝা
হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বাঙালীর দেহের চেয়ে বিড়াল কুকুরের
শরীর স্বর্গের সামগ্রী বলে বোধ হয়। আর দু’দিন পরে খালি
ভাত খেয়ে প্রাণ রাখা দার হতে দাঁড়াবে।’

এমন অনেক কথাই নয়নবোঁর গলিত কণ্ঠস্বর হইতে
বীণারবে গোপাল ও প্রবোধের শ্রবণে সুধাধারা বর্ষণ করিতে
লাগিল। উভয়ে অনিমেঘ মননে গৃহলক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া
মৃদু প্রাণে স্বর্গের সুধাধারা পান করিতে লাগিল। প্রবোধ
ব্যাকুল কণ্ঠে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, ‘বোঁঠাকুরুণ, তুমি
সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা। বল তো, এ দেশে এ দারুণ অন্ন-
সমস্যা উপায় কি?’

নয়ন কহিল, ‘মহাজনরা বা বলেছেন তাই এখন পদ্মা,
আর কিছুই নয়। আর্থ্যাবর্তের ধর্মক্ষেত্রে—ধর্ম-পথই পথ।
সে পথের গতি—সোজা চাল-চলন আর উঁচু ভজন-সাধন।
এই বলিয়া নয়ন একটু মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, ‘তোমরা
আজকাল যাক বলছ—(plain living high thinking)

তাহ'লে মনে প্রাণে গোলামী ছাড়তে হবে—বিদেশী জিনিস থাকে না—হোবে না। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী জীবনের মূলমন্ত্র বলে সত্যগ্রহে জড়িয়ে ধরতে হবে ;—

যুক্তাহার বিহারস্ত যুক্ত চেষ্টসু কর্মসু।

যুক্ত স্বপ্রাববোধস্ত যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

প্রত্যেককে এইরূপ সাধক, কর্মযোগী হতে হবে। যারা যারা দেশকে বাঁচাতে, আগাতে চায়, তাদের সহরের মোটাটাকার গোলামী ছেড়ে দেশের ঘরবাড়ীতে এসে বসবাস করতে হবে, দেশের চাষ বাসের উন্নতি করতে হবে। মাঠের জমীতে নিজের হাতে ধান, ছোলা, কলাই, সরষে বুনতে হবে, বাড়ীর বাগানে কলা, বেগুন, পেঁপে, আলু আজাতে হবে—তার সঙ্গে সব বাড়ীতেই বেশী পরিমাণে কাপাস গাছ রুইতে আর ঘরে গরু পুষতে হবে। আপনি মাঠে বেড়িয়ে গরু চরাতে লজ্জা বোধ করলে চলবে না। দেশের চাষাদের বোধ কারবারে উৎপন্ন শস্তাদির ব্যবসাই প্রাণপণে চালাবার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক পুরুষকে লোহার মানুষ হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে মেয়েদের ঠিক তেমনি হাঁচে গড়ে তুলতে হবে। খালি গাল-গল্প আর বৃথা চর্চা ক'রে এখনকার মত তারা কুড়েমৌ ক'রে কাল কাটাতে না পারে। কথাটা সকল সময় প্রাণে জপতে হবে—heaven helps those who help themselves'।

প্রবোধ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিল, 'সে চিত্ত-বিনোদিনী মনপ্রাণ বিমোহিনী চির মধুর হান্তময়ী বো'দি আর রাই ; নয়নের

সোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

সুখ-অজ্ঞান-স্বরূপিণী নয়নবো আর নাই। তাহার স্থলে এক অপূৰ্ণ দিব্য কাস্তি স্বর্গের অনল-শিখা, বাংলার পাপ-তাপ বিনষ্ট করিবার জন্য ধরার অবতীর্ণ হইয়া দাউ দাউ জলিতেছে !

প্রবোধ উদ্ভাস্ত ভাবে আপন মনে আপনি কহিল, ‘এ পাপ তাপের বাঙালী-সংসারে যদি কেউ সুখী, সৌভাগ্যবান থাকে, তবে এমন রমণী-রত্ন যার ঘরে সেই একমাত্র জন। গোপাল, তুমি ধন্য—তোমার গৃহ স্বার্থই পবিত্র স্বর্গ।’

খাওয়াইবার জন্য প্রবোধকে লইয়া নয়ন প্রস্থান করিল, গোপাল উদাস প্রাণে কত কি ভাবিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

‘গোপাল, ভাই, একখানা চিঠি আমার লিখে দেবে?’

গোপাল ব্যস্ত-চক্ষে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোথার রজনী দিদি?’

রজনী, নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে গোপালের মুখপানে চাহিয়া কহিল, ‘সে অনেক কথার কথা ভাই। রায়-গাঁ জানই-তো কি ছুট জায়াগা?’

গোপাল বোধ হয় রজনীর মুখে সবে এই প্রথম ‘রায়-গাঁ’র নাম শুনি। রজনীকে সে ভালরূপই জানিত, ভাই রায়-গাঁ’র

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কথায় বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিল,
‘তার পর?’

রজনী বহুবাড়ঘরে কহিল, ‘তার পর আর কি বলব আমার মাথা মুণ্ড! হতভাগাটা মরে গেল—ছারে-গোলায় গেল—আমায় জন্মের মত গেরে গেল! যদি মরবার আগে বিষয়টা বেচে আমার হাতে নগন টাকাগুলো দিয়ে যেতো কি একথানা কাগজ ক’রে যেতো, তা’ হলে আমার এত ভোগ ভুগতে হতো না। অনায়াসে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে দু’টো খেতে পেতাম। হতভাগার গরায় পিণ্ডি দিয়ে, বছর বছর ছেরাঙ্ক-শাস্তি করে, প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার করতাম। মরুক মরুক—এখন গাছে গাছে ঘুরে ঘুরে মরুক।’

গোপাল বুঝিল যে, বিধবা রজনী মৃত স্বামীর উদ্দেশে ঐ সকল বিশেষণের ব্যবস্থা করিতেছে। বিধবা পত্নীর পরিণামের জন্য অর্থসঞ্চয় না করিয়া, স্বামী যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরতরে প্রস্থান করিয়াছে, সেই অভিমানে ক্রোধে রজনী আত্মদ্বারা হইয়া, যখন তখন বাহার তাহার কাছে স্বত্ত্বরের সপ্তম কুল পর্য্যন্ত অভিশপ্ত করিয়া থাকে। এইরূপ স্বামী-তর্পণের মন্ত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিলে, গোপাল প্রবোধ-বাক্যে অনেক বুঝাইয়া রজনীকে প্রশান্ত করিল। রজনী উচ্চ কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া যেন আপন মনে কহিতে লাগিল, ‘বিচ্ছেদাগর বড় ভাল পথই বার করেছিল, দেশের হতভাগা লোকগুলো তা বুঝলে না! নইলে আজ আমার

ভাবনাটা কি ?' 'আমার' কথাটা বলবার সময় রজনী বিকট ভঙ্গীতে গোপালের পানে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। সে কটাক্ষের অর্থ গোপাল বুঝিল না, অথবা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না। গোপাল প্রবোধ-ভাবে কহিল, 'রজনী-দিদি, মিছে আর রাগ-অভিমান করে আপনাকে কষ্ট দিবে ফল কি ? মরণ জীবন তো ভগবানের হাত। সে বেচারী কি ইচ্ছে করে প্রাণটাকে ঘুচিয়েছে ? তোমার সুখী করতে কি তোমার নিয়ে ঘর সংসার করতে কি তার প্রাণে সাধ ছিল না ? কি করবে, সে হতভাগ্য— তোমার অদৃষ্টে স্বামীর সংসার নেই, নইলে অমন বয়সে সে মরবে কেন ?'

রজনী সদর্পে কহিল, 'মরেছে, আপদ গ্যাছে, সেজন্য কোন দুঃখ নেই।' বলিয়া রজনী আবার এক বিকট কটাক্ষ গোপালের মুখপানে চাহিল। গোপাল এবারে সে কটাক্ষের অর্থ সুস্পষ্ট বুঝিল—রজনীর হাব ভাবে চমকিত হইল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার চিঠি কি এখন লিখতে হবে ?'

রজনী কহিল, 'না, তত তাড়াতাড়ি নেই। সন্ধ্যার পর তোমার সময় হবে ? একবার আমাদের বাড়ী যেতে পারবে ?'

গোপাল অন্যান্যভাবে কহিল, 'সন্ধ্যার পর ? কেন, এখন লিখে দিই না কেন ?'

রজনী সহাস্ত্রে আবার সেই বিকট কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, 'না, এখন না, একটা কথা আছে।' আধ-আধ

ভাবে কথা কয়টি বলিয়া রজনী হেঁটমুখে মাটির পানে চাহিয়া—
 পায়ের আঙ্গুলে দাগ দিতে লাগিল। রজনীর ছুটে অভিপ্রায়
 গোপাল সম্যক বুঝিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, ‘কি কথা? আমার
 সঙ্গে তোমার কি কথা?’ রজনী ঈষৎ হাসিয়া মুক্তকণ্ঠে
 কহিল, ‘সে মনের কথা—আমি মনে মনে বলেছি, তুমি
 মনে মনে বুঝেছ। বুঝে আবার ন্যাকামি করছ কেন?’
 বলিয়া ছুটা রজনী ছুটে-হাসি হাসিল। গোপাল সদর্পে কহিল,
 ‘আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি—বুঝতে চাইও
 না। তুমি এমন কথা আর বললে আমি হারুদাদাকে সব
 বলে দেব।’ তীব্র কণ্ঠে কথা কয়টি কহিয়া গোপাল দ্রুতপদে
 প্রস্থান করিল। রজনী দলিতা-কনিণীর ন্যায় মস্তক উত্তোলন
 করিয়া দাঁড়াইল! রজনী প্রাণের মধ্যে প্রাণের ভাবে কহিল,
 ‘এর ঠিক শোধ নিতে পারি তবে এ জীবন রাখব, নইলে
 তোমার কথার মত আগুনে এ ফাঁকা অসাড় জীবনটাকে দহে
 দহে মারব।’

আপন মনে বকিতে বকিতে রজনী দ্রুতপ্রায় অসাড় দেহটাকে
 বহিরা লইয়া প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়ে খুব বাড়ন্ত। বয়সও বার পান্ন হইয়া তেরোয় পড়িল। গাঁয়ের লোক ঘাটে পথে বলাবলি করিতে লাগিল—
বুড়া বুড়ীরা বলিতে আরম্ভ করিল—‘এখনকার ওসব সাহেবী
চালচলন। বাপ পিতাম’র পিণ্ডিতে ছাই পড়ুক—লোকে যা
ঠেকে বলুক, মেয়ের বে’ কিছুতেই দেবো না, তাতে জাত
জন্ম থাক, আর থাক। আর কি সমাজ আছে, না সমাজে
সে সব ভেজী লোক আছে? এ সব অস্ত্র অনাচার কখনই
স্বর্গীয় কর্তারা সহ্য করতো না। আজই গোপাল বোসকে
একঘরে করতো, তার ধোপা নাপিত বন্ধ করে দিতো।’ এই-
রূপ নানান্তাবের নানা কথা লোকপুত্রের ঘাট পথ তোলপাড়
করিয়া ফেলিল।

বাংলার পাড়ার্পা এখন মৃতপ্রায় নীরব নিন্তক! ধন-দাত্তের
প্রাচুর্য্যে, গাহনা-বাজনা খেলা-খুলার অমোদ আহ্লাদে যে সকল
গ্রাম সর্ব্বঙ্গ মুখরিত থাকিত, সে সকল পল্লী এখন ম্যালেরিয়ার
মড়ক আর অভাব অনাটনের হাহাকারে দিবানিশি মাটীতে
নিশিয়া রোদন করিতেছে! বেশী দিন নয়—বেশী দিনের কথা
নয়—বিশ বৎসর আগে যে সকল গাঁয়ের আড়ম্বর ঐশ্বর্য্য
দেখিয়া মন প্রাণ আনন্দে উৎসাহে আকাশের উর্দ্ধে নাচিয়া
উঠিত, সেই সকল বড় বড় গ্রামের বড় বড় বাড়ী এখন

ভাদ্রিয়া জ্বলে পুриয়াছে! ভ্রাকড়া-বাঘ, বুনা-শুয়ার আর শিয়ালের আনন্দ-কোলাহলের আখড়া হইয়াছে। এই সকল যুতকল্প পায়ের ও সমাজের হৃদয় হইতে বড় বড় লোক, ভাল ভাল লোকের চিহ্নও মুছিয়া গিয়াছে। কেবল দুই কুরমতি কতকগুলো লোক সামাজিক দলাদলি মামলা মোকদ্দমা আর বিবাদ বিসম্বাদের আশুণ জ্বালাইয়া যুত পল্লীভূমিটাকে এখনও কথঞ্চিৎ জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই সকল দুই প্রকৃতির লোকগুলার মধ্যে লোকপুত্রের হারু রায় একজন প্রধান ব্যক্তি। হারু রায় বুক ফুলাইয়া সর্বজ্ঞ বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, 'সাহেবী চাল করে গোপাল বোম দেশ ছেড়ে চলে থাক। সমাজের বুকে বসে এমন দাড়ি উপড়ালে কে সইবে? হারু বেঁচে থাকতে লোকপুত্র এখনও তেমন-মরা যে, যে যা মনে করবে, তাই করবে।' বাংলার পাড়াগাঁয়ে একটা কথা আছে, 'পাঁয় মানে না আপনি মোড়ল।' হারু রায় স্বয়ং সেই প্রচলিত কথাটার এক সমুজ্জ্বল সজীব প্রমাণ। হারু রায় কর্কশ-ভাবী দুই প্রকৃতি। সে নিতান্ত দরিদ্র—মুখ। তাহাকে মানে কে? তবে সে আকাশে লাফাইয়া আপনাকে বড় দেখিত এবং পরের কাছেও আপনাকে তেমনি বড় বলিয়া বড়াই করিয়া বেড়াইত। তাহার কথার চতুর লোকে মুখ টিপিয়া হাসিত আর নির্দোষ আহাম্মুখ—প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়া আফালনে হারু রায়ের সহিত বৃথা গলাবাজি করিত। রজনী, হারু রায়ের বিধবা ভগ্নী, তাহার সংসারেই থাকে। সে বয়সে

হারুর ছোট, কিন্তু গলাবাজিতে হরকে নয় করিতে, নিরীহ নির্দোষ গরীবের জাতি নাশ করিতে, সতীর কুৎসা কলঙ্ক রটাইতে, দাদা অপেক্ষা অনেক বড় ভিন্ন ছোট কোন অংশেই নয়। গোপাল বসুর কন্টার বয়োবৃদ্ধির জন্ত হারু রায় যেমন যেখানে সেখানে পুরুষ সমাজে নানা কথা নানা ভাবে রটাইয়া কুৎসার আশুপ জ্বলাইতে লাগিল, তাহার তব্বী রজনীও মেয়ে-মহলে তেমনি কেলেঙ্কারীর বিকট হলাহল ছড়াইয়া জলজ্ঞ আশুপে দ্ব্যতাহতি প্রদান করিল।

একদিন জলের ঘাটে দশটা মেয়ের মাঝে রজনী, গোপাল বসুর পত্নী নয়নমণিকে প্রথমতঃ মিঠাকড়া ভৎসনায়, পরে বিকট গালি-গালাজে, অবশেষে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিসম্পাতে অভিনন্দিত করিল। রজনী কাঁদিতে লাগিল,—‘ঘাটে তোমরা এতগুলো মেয়ে আছ, তোমরা দশে ধর্মে বিচার ক’রে বল। বল তোমরা কার দোষ? কলিকাল! একালে কার ভাল করতে নেই। কাকেও ভাল কথা বলতে নেই। আমি তোমার ভালর জন্যই বল্লাম—এত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে মুখে ভাত উঠছে কি ক’রে—এই তো কথা! এই কথায় আমার গালমন্দ সাঁপাসাঁপি! তা কর—তোরা বা’ মনে আছে—তাই কর—তাই বল। আমি মাটির মানুষ—আমার শরীরে সব সয়—আমি সব সহিলাম। মাথার উপরে ভগবান্ আছে। তাঁর ধর্মের রাজ্যে এখনও চন্দর-সুখি উঠছে—এখনও দিন রাত হচ্ছে—তিনি কখন সহিবেন না। তিনি অবিভ্রি এর

বিচার করবেন। একদিন না একদিন এর ফল ফলবেই কলবে।’

গোপাল বসুর পত্নী নয়নমণি পরমা স্নানরী। নয়নের শরৎ-শশী সম স্নানর মুখখানিতে মৃদু-মধুর হান্ত-রেখা ভিন্ন ক্রোধ বা বিবাদ-কালিমার ছায়া-সম্পাত এ পর্যন্ত লোকপুত্রের কেহ কখন দেখিতে পার নাই। মেয়ে পুরুষ, ছোট বড় সকলেরই মাতৃস্থানীয়। মমতাময়ী নয়নমণি গোপাল বসুর হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী। অন্তরাঙ্গার পরম পবিত্র নিভৃত নিকেতনে প্রতিষ্ঠিতা সেই আরাধ্যা দেবীকে লাভ করিয়া গোপাল জীবনটাকে এতই স্মার্তক এমনই কৃতার্থ বলিয়া মনে করে যে, বিশাল জগতের মধ্যে এমন কোন জিনিস সে দেখিতে পার না, বাহার অভাবে এত বড় প্রাণটার কোন স্থান তিল পরিমাণ খালি থাকিতে পারে বা থাকিলেও কোন সামগ্রীতে শূন্য স্থানের অভাবটাকে পূরণ করিতে পারে। কি রূপের সৌন্দর্য্যে, কি প্রাণের ঐশ্বর্য্যে, কি মনের মাধুর্য্যে নয়নমণির তুলনা জগতে এক নয়নমণি ছাড়া আর কোথায়? এক নয়নকে পাইয়া গোপাল সংসারের সকলই ছাড়িতে—সকলই ভুলিতে পারে।

ক্রোধের ধারা কিরূপ, বিসম্বাদের প্রবাহ কেমন, তাহা নয়ন-মণি কখন স্বপ্নেও অল্পভব করে নাই।

চিরমধুর-হাস্তময়ী নয়ন, উগ্রচণ্ডা রজনীর কথাবার্তা শুনিয়া ও তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। হঠাৎ ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িলে কুরঙ্গিনী যেমন ভীত ত্র্যস্ত হয়, নয়নের দশাও তেমনি

হইল। নয়ন প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ কিরূপে কালভূজঙ্গিনীর মস্তকে পদক্ষেপ করিল, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া নয়ন বজ্রাহতের মত অসাড় মড়ার স্তায় পড়িয়া রহিল। তাহার নিভুই-নব মুখখানির সৌন্দর্য্যরাশি, মরুমাত্রে নিক্ষিপ্ত প্রফুল্ল কমলের স্তায় নিমিষে নিভিয়া গেল! তাহার চির-মধুর সুধা-ধারা সম হান্তরেকা বিদ্যাদর প্রান্তে লুকাইয়া গড়িল। কত ক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি কৃত্তিককর্ণে নয়ন কহিল, ‘ঠাকুরঝি, আমি জানুতে পারিনি, হঠাৎ আমার পায়ের জল ছিটকে পড়েছে। কমা কর দিদি, পায়ের ধুলো দাও।’ এই বলিয়া একটু ব্যঙ্গ-হলে হাসিয়া কহিল, ‘জলে দাঁড়িয়ে পায়ের ধুলো দেবে কি ক’রে, একটু পায়ের জল দাও। চরণাবৃত্তে খেয়ে পাপ দেহটা পবিত্র করি।’

ঘাটের সকল মেয়ে অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাৱী করিতে লাগিল। নয়ন যে রজনীকে কখন কি বলিল, তাহা কেহ শুনিতেও পার না—বুঝিতেও পারে না। নয়নের কথা নয়ন নিজেও জানে না—তাহার সৃষ্টিকর্তা বিধাতাও জানেন না। অথচ ঘাটের মাঝে রজনী এমন একটা তুফল কাণ্ড বাধাইয়া দিল, বাহাতে সকল লোক স্তম্ভিত হইল। রজনীকে গ্রামের সকল মেয়ে পুরুষ সবাই জানিত—সবাই বুঝিত। সে আকাশে ফাঁদ পাতিয়া বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়, এ কথাটা জানিতে কাহারও বাকি ছিল না। লোকপুত্রের গ্রামবাসীরা নয়নমণিকে জানিত। ঘাটের মেয়েরা নয়নকে চুপে চুপে বাড়ী বাইতে কহিল।

‘রজনী-ঠাকুর ঝি পাগোল’ বলিয়া হাসিতে হাসিতে নয়ন ভাড়াভাড়ি স্থান সারিয়া গৃহে গমন করিল। রজনীর তর্জনে পর্জনে আকাশ পাতাল আলোড়িত হইল। ‘আমি পাগোল’ অত বড় ধেড়ে মেয়েটাকে ঘরে পুষে যে কাণ্ড কারখানা করছে, তা লোকে জানে না? লোক সব কানা? এর শোধ কেমন ক’রে তুলতে হয়, তা দেখাচ্ছি—রও।’ এইরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে রজনী বাড়ী আসিয়া হারু দাদার সম্মুখে আছ-ডাইয়া পড়িল। হারু বুঝিল, তাহার শূর্ণনখা ভগিনী—ঘাটে নিশ্চয়ই কোন বিধম কাণ্ড বাধাইয়াছে। রজনী বাল-বিধবা—স্বন্দরী হউক না হউক কদাকার নহে। রজনী মাঝে মাঝে বৎসরের মধ্যে দুই একবার কলিকাতার যাতায়াত করিত। সে যে কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাইয়া থাকিত—তাহা লোক-পূর অঞ্চলের কেহ জানিত না। রজনী গলা বড় করিয়া গ্রামে আসিয়া বলিয়া বেড়াইত—তাহার দেবর হাইকোর্টের একজন খড় উকিল। লোকপূরের লোকেরা তাহার কথা কাণ পাতিয়া শুনিত আর মুণ টিপিয়া হাসিয়ানীরবে থাকিত। কলিকাতায় যাতা-রাতের ফলে রজনী হাতে কিছু টাকা জমাইয়াছিল। সেই কারণে আর হারু রায়ের তৃতীয় পক্ষের পত্নী নাবালিকা বলিয়া রজনী হারুর ঘরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিল। হারু ও রজনী দুই ভাই ভগ্নীর মধ্যে আন্তরিক মায়া মমতা ছিল কি না তাহা তাহারা নিজেরাও অনুভব করিতে পারিত না। বাস্তবিক পক্ষে উভয়ে আপন আপন স্বার্থের বশে পরস্পরের প্রতি স্নেহের ছলনা প্রকাশ করিত।

রজনী হারুর সম্মুখে পড়িয়া উঠেই কাদিতে কাদিতে কহিল, 'আজ ঘাটের মাঝে দশ-ধর্মের সামনে নয়নবোঁ অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ যদি নিতে পার, তবেই দাদা তোমার ঘরে থাকবে, নইলে বিষ খেয়ে মরবে, নয় তোমার সংসার ছেড়ে বে দিকে দু' চক্ষু যায় সেই দিকেই চলে যাব।'

যদি রজনীর প্রাণের প্রত্যেক শিরা চিরিয়া চিরিয়া পরীক্ষা করিয়া ছুনিয়ার কেহ কিছু বিশ্লেষণ করিয়া পাইয়া থাকে, তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এক হারু ছাড়া আর কেহ নহে। হারু রজনীর কথা নীরবে শুনিয়া কিছুকাল নীরবে রহিল। নয়ন বোঁ কি বলিয়াছে, কেন বলিয়াছে সে সকল কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না—করিবার প্রয়োজনও কিছু বোধ করিল না। কেবল দম্ভভরে গগন কাটাইয়া কহিল, 'তার ষোঁগাড় আমি করেছি। গোপাল বোস মেয়েটাকে দিয়ে সংসার চালাচ্ছে এ অঞ্চলে এখন কে তা না জানে? সমাজ আর ক'দিন তার এ পাপের অভ্যাচার সহাবে? মিত্তির-বাড়ী ভোজের দিন তাকে কে রক্ষা করে দেখবে। সে ভোজে সমাজের কোন গাঁ নেমন্তন্ন বাদ পড়বে না। সেই দিনে তাকে বুঝে নোব।'

হারু নানা প্রবোধের ছলে ভয়ী রজনীকে উঠাইল। হারুর সংসারে পাকশালার প্রধান কার্যভার ছিল, রজনীর হাতে। রজনী দাদার কথায় আশ্বস্ত হইয়া ধীরে ধীরে মন্ডুর গমনে পাকশালায় গমন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোপাল বহু লোকপূরের সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তি। তাহার বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে, কিন্তু তত্পরি চাকরী না করিলে সচ্ছল ভাবে সংসার চলে না। গোপালের পিতা পাল-চৌধুরীদের নারৈবী করিয়া বাহা কিছু করেন, তাহাতে গোপালকে বি-এ পরীক্ষা পড়াইতে সব খরচ হইয়া যায়। তিনি যখন মৃত্যুশয্যা পড়িলেন, তখন গোপাল কলেজ ছাড়িয়া বাড়ী আসিল, মাতার গহনাপত্র ও নগদ বাহা কিছু ছিল সব পিতার চিকিৎসায় গোপাল ব্যয় করিল। পুঁজী সবই খরচ হইয়া গেল, অথচ পিতাকেও বাঁচাইতে পারিল না। পিতার মৃত্যুকালে গোপালের মাতা বৃত্ত স্বামীর পদতলে পড়িয়া কাদিতে কাদিতে কহিলেন, ‘আমি রহিতে পাববনি—আমার শীগগির ডেকে।’ সন্তীর ক্রন্দন ধর্মরাজের সিংহাসন টলাইল। উপর হইতে গোপালের জননীর ‘তলব’ আসিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিন দিনের মধ্যে পত্নীও পরলোক প্রস্থান করিলেন। গোপাল বেশ ব্যরভরণ করিয়া পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিল। গোপাল দেনদার হইল—তাহার ভূমি-ভদ্রাসন বন্ধক দিল।

গোপাল পড়ার আশ ছাড়িল, পত্নী নয়নমণি ও কন্যাকে লইয়া বাড়ী বসিয়া স-সার-ধর্ম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মেদের বয়স প্রায় পনের হইল। পিতৃ-মাতৃদ্বায় শেষ

হইলে কতাদায়ে গোপাল বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। নানা লোকে নানা কথা নানা ভাবে বলিতে লাগিল। গোপাল আপনার কথা পরের মুখে শুনিয়া মৃতপ্রায় হইয়া ঘরের কোণে অবরুদ্ধ রহিল।

নয়ন আসিয়া নীরবে রহিল। পাছে নির্যাস পতির প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে এই ভাবিয়া ঘাটে রজনীর সহিত তাহার যে কাণ্ড ঘটয়াছিল, তাহার কিছুই উল্লেখ করিল না। তাহার বিষন্ন বদন হইতে মুহূৰ্ধর হাসির রেখাটুকু যেন চিরতরে বিলুপ্ত হইল। চির-বসন্ত-রূপিনী মাধুর্য্যময়ী নয়নের নিভুই নব ভাবটুকু লুকাইয়া গেল, কিন্তু পতির প্রাণের দৃষ্টিতে তাহা সহজেই ধরা পড়িল। পত্নীগত-প্রাণ গোপাল বুঝিল, ব্যাপার কিছু গুরুতরই ঘটিয়াছে। নতুবা এমন মাধুর্য্যময়ী সৌন্দর্য্যের সাদর—নিমিষে শুকাইল কেন!

রক্তনের পূর্বে নয়ন স্বামীকে প্রতিদিন ‘কি রান্না হইবে’ জিজ্ঞাসা করিত। আজ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে বিরস বদনে একমনে রন্ধন করিতে লাগিল। নয়নমণি সত্যই নয়নমণি। নয়নের বিরস বদন দেখিয়া গোপালের চক্ষে জগৎ সংসার ঐশ্বর্য্যময় বোধ হইল। নয়নকে লইয়া গোপাল দরিদ্র সংসারের গুরুভার তুলার মত হাল্কা বোধে হাসিমুখে বহিয়া বেড়ায়। এ জীবনে যে ভাবিবার কোন কথা বা অভাবের কোন সামগ্রী আছে বা থাকিতে পারে, ইহা স্বপ্নের ঘোরেও তাহার মনের কোণে উদয় হইবার অবসর পায় না। সে জীবনে

জগতের সবই সহিতে পারে, সবই বহিতে পারে, পারে না কেবল একটা জিনিস—নয়নের বিষাদ-কাগিমাখা মুখখানি। তাহাও এতদিন তাহার সুদীর্ঘ জীবনে—বিবাহের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল—এতকালের মধ্যে কখনও ঘটে নাই। গোপাল বখনই কোনও দায়ে ঠেকিয়াছে, বখনই কোন ভাবনার স্রোতে ভাসিয়াছে, তখনই নয়ন মাথা পাতিয়া তাহার দায়ের বোঝা—ভাবনার ভার আপনার ঘাড়ে চাপাইয়া স্বামীকে শাস্তির শয্যায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। আজ তাহার ভারাক্রান্ত জীবনের দৃঢ় খোঁটা কেন হঠাৎ এমন মচ্কাইল? গোপাল অদীর হইয়া উৎকণ্ঠিত প্রাণে নয়নের নিকট রান্নাঘরে উপস্থিত হইল। নয়ন তখন শুল্কপ্রাণে একদৃষ্টিতে শূন্য আকাশের পানে চাহিয়াছিল। গোপাল সম্মুখে উপস্থিত হইলে নয়নের উদাস জড়তা ভাঙ্গিয়া গেল, সে পতির মৃষ্টি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। স্বামীর উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতা দেখিয়া নয়নেরও সু-গভীর প্রশান্ত প্রাণ বিচলিত হইল। স্বামীর মুখাপনে চাহিতে চাহিতে নয়নের নয়ন ভট্টতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বে দুঃখের প্রতিকার অসম্ভব দুঃসাধ্য, তাহার বিনিময় দরিদ্রের পক্ষে নীরব অশ্রু ব্যতীত ভগতে আর কিছুই নাই।

গোপাল কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কখাটা কি, কি হয়েছে নয়ন?’

নয়ন অকণ্ঠে অশ্রু মুছিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল, ‘কৈ, না, কিছুই তো হয় নি!’ গোপাল কহিল, ‘ভূমিকম্প ভিন্ন পর্বত কাঁপে

না। নিশ্চয় কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। কি হয়েছে বল।’

নয়ন স্বয়ং শাস্তি-রূপিনী। বিবাদ বিসম্বাদে সে নিতান্তই নারাজ। আসল কথাটা চাপা দিবার অছিলায় সে বাক্জালে বাজে কথা তুলিল। গোপালের মন তাহা মানিল না—গোপাল তাহা বুঝিল না। গোপাল স্বভাবতঃ ধীর প্রকৃতি! তাহার অটল প্রাণ অনায়াসে সকলই সহিতে পারে, কেবল নয়নের সামান্য বস্রণা তাহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করে। নয়নের চক্ষে জল তাহার পক্ষে বিবম বজ্রাঘাৎ। সে বজ্রাঘাৎ নিবারণ করিতে গোপাল আপন হাতে হাসিতে হাসিতে আপন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়—নয়ন তাহা জানিত। তাই সে বুঝিয়া ছিল, ঘাটের ব্যাপার স্বামী জানিতে পারিলে লোকপূর-অঞ্চল প্রলয়ের ঝড়ে প্রকম্পিত হইবে। সে প্রবল-বস্তার বেগ বালির বাধে রুদ্ধ হইবে না। নয়ন স্মৃত পিতা মাতার কথা, স্বশ্রুত স্বাশুভীর কথা তুলিয়া বিবম প্রলয়ের আঙুন নিভাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নয়ন যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, গোপালের জেদ ততই বাড়িতে লাগিল। গোপাল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, ‘তোমার ওসব ফাঁকা মুখের ফাঁকা কথা আমি শুনব না, কথাটা কি, তোমার বলতে হবে। ভূকিকম্প সহজে হয় না! তোমার চখে জল কখনও সহজে আসে নি।’

নয়ন বড় দায়ে ঠেকিল। কথটা বলিলেও দায়, না বলিলেও দায়। পাষণ্ড-প্রতিমার স্তায় নয়ন স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল,

গোপাল উত্তেজিত হইল। নয়নের জন্ত কি—নয়নের কাছেও তাহার জীবনের এমন উত্তেজনা কখনও ঘটে নাই। গোপাল গম্ভীর গর্জনে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া কহিল, ‘তোমার চথে জল কে এনেছে, বলতে হবে।’

নয়ন নবনীসম কোমল প্রাণকে দৃঢ় পাষাণে বাঁধিল। সে দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, ‘চোখের জল সহজে আসে না, পরেও আসে না। বড় কষ্টে আপনার কপালের ফলে চ’থে জল আসে।’

গোপাল কহিল, ‘হঠাৎ আজ কপালে এমন কি ফলুলো যে, তোমার চথে জল এলো?’ স্বামীর মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অবনত দৃষ্টিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নয়ন কহিল, ‘যতই দিনের পর দিন যাচ্ছে—ততই উবার ভাগ্যের ভাবনা জলন্ত আগুনের মত আমার প্রাণের মধ্যে দাউ দাউ জ্বলে উঠছে।’ দৃঢ় দেহ দীর্ঘ-বাহ গোপাল—লোহার মত কঠোর কঠিন করিয়া মাথা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ‘উঁহ উঁহ, তা নয়—তা নয়, কথাটা লুকিও না। আমার কাছে লুকোতে হয় এমন কথা তোমার প্রাণে কিছু নেই—কিছু থাকতে পারে কি?’

নয়ন কহিল, ‘তোমার কাছে লুকিয়ে যে জীবনে কথা রাখতে হবে, সে জীবনে তো কোন দরকার দেখি না।’

গোপাল...তবে বল কথাটা কি?

নয়নমণির মুখমণ্ডল জলভরা প্রাণের মেঘের মত ভারাক্রান্ত হইল। নয়ন অকলে চক্ষু মুছিয়া ভয় কণ্ঠে কহিল, ‘উমা

হয়েছে আমার বৃকের কাঁটা। তার জন্তই দশ জনের দশ কথা শুনতে হচ্ছে।’

গোপাল...হাঁ, সে ত নূতন কথা নয়; আজ ছ’ তিন বছর থেকে সে কথা শুনছি। আজ নূতন কথা কে কি বলে, তাই বল। নুঁকিও না।

নয়ন ছোট ছোট হাত দু’থানিতে স্বামীর হাত দু’থানি ধরিল। কাতর কণ্ঠে কহিল, ‘দেখ, আমার দিব্যি—কথাটা বলবো, কিন্তু কোন গোলমাল করবে না তো? আগে শোন, আমার মাথার দিব্যি, বল, কোন ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না?’

গোপালের মুখে হাসি আসিল। গোপাল হাসিমুখে কহিল, ‘তুমি যে কাজ বারণ করবে, জগতে আর কেউ আমার তা’ করাতে পারে?’

নয়নের বৃকের পাথর নামিল। তাহার অধরপ্রান্তে আবার সেই চির-সুধাময় মুদুহাস্তের প্রভা ফুটিল। হান্তময়ী নয়ন কহিল, ‘দেখ, তোমার ভাব দেখে আমার সময়ে সময়ে বড় ভয় হয়।’

গোপাল বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আমার ভাবে তোমার ভয় হয়, এমন কোন্ দিন কি ভাব আমার দেখলে।’

নয়ন—জীবনে ছ’ একদিন যেন দেখেছি। যে দিন হুঁ-চাবার ছুঁখিনী মাকে গাঁয়ের জমিদার সত্যাবাবু বিনা অপরাধে মেরেছিলো, সে কাদতে কাদতে এসে তোমার পায়ে তলে

পড়েছিলো—সেই দিন দেখেছিলাম তোমার ভীষণ মূর্তি, আর একদিন রাধী-ঠাকুরাণ মরা-ছেলে কোলে ক’রে কাঁদছিলো, পায়ের লোক ফেলতে বার হয়নি, সেই দিন দেখেছিলাম তোমার করাল মূর্তি ! তোমাকে দেখে আমার ভয় হয়েছিল। মনে হয়, সে মূর্তি দেখে স্বয়ং যমেরও ভয় হয়। তাই সব কথা তোমার বলতে সাহস হয় না।’

গোপাল হাসিতে হাসিতে কহিল, ‘তুমি অনায়াসে বলতে পার, কোন ভয় নাই। কি কথা হয়েছে?’

নরন কহিল, ‘উবার কথা তুলে রজনী-ঠাকুরাণি কত কি বলে?’

গোপাল কি বলে?

নরন.. জাতি মারবে, একঘরে করবে, আরও কত ভয় দেখালে।

গোপাল.. তাতে তুমি কি বলে?

নরন.. তার কথায় আমি কি বলব? আমি চোরের নত চুপে চুপে চলে এলেম। নিজেরা যখন দোষী—তখন পরকে কি বলব?

গোপাল সমস্তে কহিল, ‘কেন? নিজেরা দোষী কিসে?’

নরন... এত বড় মেয়ে ঘরে, হিন্দুর ঘরে সাজে কি?

গোপাল সগর্বে কহিল, ‘ও. সব সেকেলের ভাব—সেকেনে কথা ছেড়ে দাও। এখন আর সমাজ থোকা খুকীর বিয়ে দিতে

ভালবাসে না। সেকলে গৌরী-দান আর আদরের জিনিষ বলে সমাজে চলছে না।’

নয়ন হাসিয়া কহিল, ‘দেশময় তো বেঙ্গ-সমাজ বনেনি, ঘরে ঘরে কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রীও জন্মায়নি। বহু হিঁদু বৃকে ধরে এখনও হিঁদুর সমাজ বেঁচে আছে।’

গোপাল যখন বি-এ পড়া ছাড়িয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ চটতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন বাংলার শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব খুব প্রবল হইয়াছিল। ‘বিধবা বিবাহ’ ‘বালিকা বিবাহ’ প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া তখন এদেশে শিক্ষিত সমাজে একটা প্রবল আন্দোলনের স্রোত বহিয়াছিল। গোপালও বহু সহতীর্থের সহিত সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। গোপাল স্বীয় অর্ধাজিনীকে আপনার মনের মত করিয়া গড়িবার পক্ষে সাময়িক শিক্কা দীক্ষা দিতে কিছুমাত্র জটিল করে নাই। হিঁদুর মেয়ের স্বাভাবিক সহজাত সংস্কার সহজে ঘুচে না। নয়ন সকল বিষয়ে গোপালের উন্নতিশীল মতের বা প্রকৃতির অল্পবর্তন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ বালিকা বিবাহ, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাহার প্রাণে আনিক সমুন্নত অভিমতের প্রতি একটা বিকট বিষেব বহুমূল ছিল। গোপাল যখন ‘বিধবা বিবাহের’ প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার সহিত আলোচনা করিত, তখন নয়নের অশ্রুরাস্রা শিহরিয়া উঠিত। কথাটা ভাবিতও—স্বামীর মৃত্যুর পর আর একটা স্বামী গ্রহণ—স্রীলোকের পক্ষে কি বিকট ব্যাপার—

১১৪ নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা

কথাটা প্রাবর্ত্তেও সতী-সাক্ষী আদর্শ-রূপিনী নয়নের প্রাণ থরথর কাঁপিত।

মেয়েকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দেওয়াও নয়নের পক্ষে ভাল বলিয়া বোধ হয় না। নয়ন কহিল, 'সে তুমি যাই বল, যাই কর, উষাকে আর রাখা ভাল দেখায় না। আমি নিজের চ'খেই ভাল দেখি না, পরে দেখবে কেন? পরে পাঁচ কথা বলতেই পারে।'।

গোপাল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'বলে আমার বলবে—আমার সামনে বলবে। তোমায় বলবে এমন নাথা কার ঘাড়ে?'

নয়ন কহিল, 'তুমি আমি কি ভিন্ন? তোমায় কথা বলা আর আমার বলা একই।'

গোপাল সদর্পে কহিল, 'কি বলব, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়েছি, নইলে কেমন মেয়ে—কেমন হারুরায়ের বোন রজনী আদ্য বুঝে নিতুম।'

কথা কয়টা কাঁপিতে কাঁপিতে কহিয়া গোপাল কাঁপিতে কাঁপিতে বেগে চলিয়া গেল। নয়ন জানিত, গোপালের কথা ও কাজ একই। যখন গোপালের মুখ হইতে একবার বাহির হইয়াছে, তখন আর সে কথা নড়িবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লোকপুর কিছুদিন পূর্বে সে অঞ্চলের খুব বড় গণগ্রাম ছিল। রাস্তা-ঘাট, বাজার-হাটের খুব জাঁকজমক ছিল। বহু জাতীয় বহু লোক বাস করিত। বহু বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় মহাজন, বড় বড় চাকুরে, বহু ধান-ভরা-মরাই, শস্ত-বোঝাই গোলা-পালাওয়ালা কৃষক মহাজনগণের কাজ কারবারে লোকপুর বড় সহরের মত সর্বক্ষণ মুখরিত থাকিত।

লোকপুরের সে উন্নতির দিন আর নাই, তাহার সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্য অন্তর্মিত! ভীষণ ম্যালেরিয়ার মড়কে লোকপুর মানুষের পরিবর্তে শিয়াল শকুনির আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। অনেক লোক, বহু পরিবার, বাড়ীকে-বাড়ী মারা পড়িয়াছে। বড় বড় বাড়ী জঙ্গলে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাহারা দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় বা অপর কোন সহরে বাস করিতেছে, কতকগুলি বনিয়াদি বাসিন্দা পৈতৃক-বাস্ত্র মাতৃভূমির মায়ায় বা ভূমি সম্পত্তির লোভে, অপর কতকগুলি বাজে লোক অক্ষমতা ও অভাবের পীড়নে গ্রাম ছাড়িতে পারে নাই। এই সকল অধিবাসীগণের মধ্যে গোপাল বনু প্রথমোক্ত দলের আর হারু রায় শেষোক্ত দলের লোক। গোপাল বনু পিতা, পিতামহের ভূসম্পত্তির মায়ায় আর হারু রায় অক্ষমতা অভাবের পীড়নে গ্রাম ও বাস্তবাসী ছাড়িয়া বাইতে পারে নাই।

লোকপুরে এখন 'ভাল' লোক প্রায় নাই। যে দুই চারিজন নির্দোষোন্মুখ দীপশিখার জায় মিট মিট জ্বলিতেছিল, গোপাল

বনু তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। অভাবের তাড়নে তথাকার অধিকাংশ লোক প্রায় মন্দমতি—দুষ্টচরিত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। যেমন রূপে তেমনি গুণে—হীনদেহ কীণপ্রাণ শ্রী-ব্রট হইয়া, তাহারা শিখাল শকুনির মত আপনা আপনি খাওয়াখানি, মারামারি করিয়া ভারাক্রান্ত জীবনকে বিড়ম্বিত—কষ্টকিত করিয়া অতি কষ্টে শুষ্ক শীর্ণ পরমায়ুকে ক্ষয় করে। কেবল মামলা মোকদ্দমা, বিবাদ বিসম্বাদ বা দলাদলির কথা শুনিলেই তাহাদের অসাড় দেহ, নিষ্কর্জীব প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। সুবিধামত আত্মীয়ের ঘরে চুরি করা বা চোরের সাহায্য করা, পুলিশের মামলা সাজানির পোষকতা করা, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া—সেই সকল পতিত পাপমতিগণের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। পাঁজা, চরস আদি নিকট নেশা সেবন তাহাদের জীবনের পরম আনন্দ—চরম উদ্দেশ্য। সামান্ত কিছু অর্থ পাইলে তাহারা বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। দুট চারিটা টাকায় বশীভূত হইয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে সাধু সজ্জনের জাত মারিতে—কুলবতীর কুল কলঙ্কিত করিতে—নিরীহ ব্যক্তির হাতে মাথা কাটিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পোষা শালিত কুকুরের মত হারু নায়ের বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। রজনীতরু রূপ বোবন অর্থ ও ভাবভঙ্গী তাহার একটা প্রধান কারণ।

ঘাটের মাঝে নয়নবোকে বিনা কারণে অনেক কথা শুনাইয়া—পদ্মকূলে বজ্রাঘাত করিয়া—রজনী বাড়ী আসিয়া, ভাই

হারু রায়ের সহিত পরামর্শ খাটিতে লাগিল। রজনী কহিল, ‘দাদা, তুমি জনা চাটুষ্যকে হাত কর, টাকার পিছিও না। টাকা আছে—আমি আছি।’

হারু, ভয়ীর উৎসাহ পাইয়া লোকপুত্রের বদমায়েস-দলের সর্দার জনা চাটুষ্য ও তাহার দলহু অপরা পাঁচ জনকে হাত করিল। রজনী দুই হাতে টাকা ছড়াইতে লাগিল। গোপাল বস্তুর বিরুদ্ধে সম্বর একটা বিষয় বৈরীদল ও ভীষণ ষড়যন্ত্র হইল।

গোপাল কলেজ ছাড়িয়া লোকপুত্রের কয়টি স্ত্রীলোক তরুণ বয়স্ক ছাত্রকে লইয়া আপনার বৈঠকখানার একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। গোপালের চরিত্রগুণে সহনশীল ছাত্রগণ তাহাকে যেমন হৃদয় ভরসা ভক্তি করিত, তেমনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তাহার গোলাপের অল্প দুপুর রাখে জলে ডুবিতে পিছাইত না। ছাত্রগণের মধ্যে পিতৃহীন ছেলে বিজন অনেক সময় গোপালের বাড়ীতে থাকিত। গ্রাম সম্পর্কে গোপাল তাহার খুড়া। তাই উবা, বিজনকে দাদা বলিয়া ডাকিত। বিজন, উবাকে ছোট বোনের মত স্নেহ করিত। এই পবিত্র স্নেহ মমতাকে বিকট সাজে সাজাইয়া ‘হারুর দল’ লোকপুত্রের একটা ভীষণ আন্দোলনের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। ঘাটে পথে নানা স্থানে নানাজনে নানা ভাবে গোপালের ঘরের কুৎসা কলঙ্কের কথা বাহির করিতে লাগিল। তাহার ফলে নগরের ও উবার ঘর হইতে বাহির হওয়া বিষয় দায় হইয়া ইঠিল।

উবার মুখে বড় একটা কথা কেহ কখন শুনিতে পায় না।

গোপাল সময়ে সময়ে হাসিয়া উঠাকে ‘দেবকন্ডা’ বলিয়া ডাকে। দেবকন্ডা নরলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে না বলিয়া, গোপাল সময়ে সময়ে কন্ডা উঠার সহিত ব্যঙ্গালাপ করিয়া থাকে। একেই উঠার মুখে সাত-চড়ে কথা নাই, তত্বপরি বিজন সম্বন্ধে তাহার প্রাণঘাতী কথার রটনা হওয়ায়, উঠা মরমে মরিয়া একেবারে মাটিতে মিশিয়া গেল। গোপালের স্নানর স্প্রশস্ত মুখের হাসি, উজ্জল চক্কের প্রতিভা লুকাইল--তাহার শরীর শুষ্ক, শীর্ণ হইল। যে নরনকে সম্মুখে দেখিলে, গোপাল হাসিমুখে স্বর্ণ-সুখকে পায়ে তৈলিতে পারিত, সেই নরন আজ তাহার শূন্য দৃষ্টিতে মহাশূন্যে ভাসিয়া গেল।

কয়দিন পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে স্থল কলেজ সব বন্ধ হইল। গোপালের প্রাণের বন্ধু প্রবোধ সেই ছুটি উপলক্ষে বাড়ী আসিল। প্রবোধ গোপালের বাল্য-সহচর, সমপাঠী, এক গ্রামবাসী। গোপাল পাড়া ছাড়িয়া নরনকে হৃদয়ে ধরিয়া অভাবের সংসারে দুঃখের ভাত পরম সুখে থাইতেছিল। প্রবোধও পড়া ছাড়িয়া কলিকাতার স্থল-মাষ্টারী করিতেছিল। প্রবোধ বাড়ী আসিয়া, পত্নীর মুখে গোপালের পারিবারিক ব্যাপার শুনিল। গোপালের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সে গোপালকে ও তাহার স্ত্রী কন্ডাকে ভালরূপেই জানিত। গ্রামের ছরাতারগণের ব্যবহারে প্রবোধ প্রাণে বড় ব্যথা পাইল।

প্রবোধ নিদাঘের মেঘের মত মুখখানা বিবল ও ভারাক্রান্ত

সোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

করিয়। গোপালের কাছে আসিল। গভীর কণ্ঠে কহিল,
‘কি ঠিক করে? আমি তো বলেছিলাম, গায়ে বসে
থেকো না।’

গোপাল মৃত-চক্ষে প্রবোধের কথা কহিল—
‘তাহার মুখ হইতে কোন কথা শুনিলে
গোপালের অসাড় গায়ে ধাক্কা দিয়া কহিল,
‘মন ধরাপ করো না। ওরা তো কড়কড়ি
কথা কে ধরে?’

এতক্ষণে গোপালের অসাড় চেতনা
উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, ‘এখন কি আর
তো এখন শিয়াল কুকুরে ভরে গেছে। ওদের কথাই এখন
কথা, ওদের কাজই কাজ।’ প্রবোধ কহিল, ‘তা হলে বল,
লোকপূর মরে গেছে। এমন মরা-গায়ে থাকতে নাই।’ গোপাল
কহিল, ‘কতগুলো শিয়াল কুকুরের ভরে গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়াও
তো বড় লজ্জার কথা।’

প্রবোধ সুদর্পে কহিল, ‘বদি শিয়াল কুকুর বলে তাদের বুঝে
থাক, অত ভয় সঙ্কোচ কিসের?’

গোপাল... মিথ্যা ভয়, মিথ্যা সঙ্কোচ তাও জানি, তাও বুঝি।
সমাজের কুসংস্কার কু-প্রথা দূর করতে অনেক সহগুণ চাই তাও
মানি। হিন্দুর প্রাণে কি যে জাতীয় হুর্নতা—সে অনায়াসে
সব সইতে পারে, পারিবারিক গ্লানি কুৎসা সে কিছুতেই সইতে
পারে না।

প্রবোধ কহিল, 'তা না পারবে তো আগে সতর্ক হলে না কেন?'

শ্যামল কহিল, 'এমন উচ্ছন্ন গেছে তা আগে বুঝতে

হয়নি। এখন কর্তব্য কি ঠিক

শ্যামল কহিতে লাগিল, 'আমি
এখন এ গ্রাম ত্যাগ করাই
৯, ১৭ বারের কোলে পালিত হয়ে এত বড়

হলেম, যে মায়ের মত বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করলে তাকে
মরণের দশার ফেলে আপনার সুখ সাজ্জন্দ খুঁজতে যাওয়া
কি মানুষের কাজ? তা নয়, কাজটা খুবই মন্দ। মানুষের দেহ ধরে
মানুষের জীবন পেয়ে যে দেশের জন্ত—জন্মভূমির জন্ত কিছু না
ক'রে কেবল আপনার ভোগ আপনার ঐশ্বর্য নিয়েই চিরজীবন
বাস্ত থাকে, সে কখনই মানুষ-নামের যোগ্য নয়। মৌমাছি পিপড়ে
পর্যন্ত দশটার মিলে আপন আপন জায়গার জন্য খাটে, মানুষ
হয়ে যে তা বোঝে না, মানে না, সে যে মানুষের আকারে ইতর
জানোয়ার—এ কথা খুবই মানি—কিন্তু তাই, দেশ তো আর
নেই, দেশ মরে গেছে—কঙ্কাল হয়েছে। সেই কঙ্কাল নিয়ে
কতকগুলো ভূত পেত্নী হেঁড়ার্ছিঁড়ি করছে।

গোপাল কহিল, 'কথাটা আমি কোনকালেই মান্তে

সোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

রাজী নই। এখনও আমাদের পাড়াপীয়ে দু'একটা ভাল প্রাণ আছে—তাহাই দেশের শক্তি। তাদের নিয়ে গাঁয়ের জন্ত খাটতে পাল্লে এখনও মরা দেশকে বাঁচানো যায়। আমিও তাই মনে করেছিলাম আর তাই মনে করেই এত স'য়েও গাঁয়ের কোলেই মাথা দিয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, প্রাণ দিয়ে গাঁকে জাগাবো। গাঁ-গুলো জাগলে, দেশ জাগবে। বাস্তবিক কথাটা খুবই সত্য যে, যে গাঁ সেই দেশ। গাঁ-গুলোকে না জাগালে কখনই দেশ জাগবে না। জাতটা সহরে বাস করে না—জাতটা দেশে গাঁয়ে-ই থাকে।'

প্রবোধ, গোপাল দুই জনেরই দেহে এখনও যৌবনের খুব গরম রক্ত বহিতেছে। এখনও কলেজের গন্ধ তাহাদের ধমনী বহিয়া ছুটিতেছে। সংসারের স্বার্থপরতা বা দেশের আবহাওয়ার জড়তা এখনও তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বাংলার মৃত মাটিতে মিশাইতে পারে নাই। দেশের জন্ত, জাতটাকে জাগাইবার জন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে—এ কথাটা তাহাদের প্রাণের প্রত্যেক পরমাণুতে অল্প প্রাণিত রহিয়াছে। লোকপুৰ গ্রামে এখনও পর্য্যন্ত আরও কয়জন শিক্ষিত যুবক আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ মুনসেফ হইয়া কখন শলদীপে কখন বারিপুরে ঘুরিতেছে, আর বদলি হইবার সময় প্রত্যেকবার হাইকোর্টের সপ্তম পুরুষ অভিশপ্ত করিতেছে। কেহ ওকালতি আরম্ভ করিয়া আদালতের বৃক্ষতলে ঘুরিতেছে আর শুল্ক চক্কে, হতাশ প্রাণে, ঘান মুখে উনিভারসিটীকে নরকস্থ

করিতেছে। দেশের কথা ভাবিবার বা বুঝিবার জন্ত তাহাদের সময়ও নাই প্রয়োজনও নাই। অবশিষ্ট যে দুই একজন, প্রবোধ বোধের মত শুলমাটারী বা অন্ত কোন কাজ করে, তাহারা ছুটি উপলক্ষে গ্রামে কখন আসিয়া সখের সভা সমিতি করে ও বক্তৃতার গলাবাজীতে ও স্বদেশী-সঙ্গীতে দেশ উদ্ধারের সংসারী গ্রহসন অভিনয় করিয়া থাকে—গোপাল ও প্রবোধ তখন তাহাদের মাথা হইয়া দেশের জন্য কিছু করাইয়া লইবার চেষ্টা করে।

গোপাল ও প্রবোধ মনের আবেগে আপনাদের দেশ গ্রাম সম্বন্ধে কিছুকাল কথাবার্তা—আন্দোলন আলোচনা চালাইল। অবশেষে উঠিবার সময় প্রবোধ উৎসাহভরে কহিল, ‘কিছু ভেবো না, কিছু মনে ক’রো না। শীগগির এ ঝড়ো-মেঘ উড়ে যাবে ও আবার ফরসা হবে।’

গোপাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ‘আমার যে একঘরে করতে চায়।’

‘একঘরে না হয় দু’ঘরে হয়ে থাকবে’ বলিয়া প্রবোধ হাসি মুখে প্রস্থান করিল।

বর্ষ পরিচ্ছেদ

হাল রায়ের ঘরে একটা খুব জাঁক-জমকের মজলিস জমিরাছে। জনা চাটুষ্যে, হরি রায়, মতি বোস প্রভৃতি দলবল লইয়া গোপালের গৃহ-পরিবার সম্বন্ধে একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিরাছে! মতি বসু, গোপালের জাতি-শত্রু। গোপালের বাস্তব-ভিটার সহিত গোপালের বাস্তব সংলগ্ন। গোপাল, বিশ্ব সম্পত্তি টাকা কড়ি সম্বন্ধে চিরদিনই উদাসীন, আবার এক আঙ্গুল জমি, মতি বসুর পাজরার হাড়। একটা ভেরাওয়ার বেড়া, মতিও গোপালের বাড়ীর বাগান দুইটাকে দুই ভাগ করিয়া রাখিরাছে। সেই বেড়ার গোড়ার সীমানা লইয়া, কখন আগার সীমানা লইয়া মতি প্রায়ই গোপালের সহিত গোলযোগ বাধাইয়া থাকে। যে দিন মতি দুই চারিটা ভেরেওয়ার গোড়া গোপালের জমির দিকে এক বা আধ-আঙ্গুল আগাইয়া দেয়, সেই দিনই তাহার সীমানার বিবাদ খুব সজোরে জাগিয়া উঠে; সেই দিন সে লক্ষ্য-ক্ষম্বে ভূমিকম্প করিয়া, চীৎকারে গগন কাটাইয়া পায়ের পাচজন জড় করে। গোপাল যেমন বিষম-বিরাগী তেমন বিবাদের বিষম বৈরী। বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে পাছে মতি স্বী কস্তা সহ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, পাছে কার্য-গতিকে কোন প্রকারে কুল-ললনার কিকিতন্যাত্ত্রানি বা মান সম্মের হানি ঘটে, এই আশঙ্কার জড়সড় হইয়া গোপাল এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া

থাকে। মতির কথা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইলে, গোপাল কৃষিক উত্তেজনার বশে প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়, নয়ন ক্রমপদে আসিয়া তখন গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহে লইয়া যায়। শ্রীরের যে পাঁচজন দেখিতে শুনিতে আসে, তাহারা মতির দাপে ভীত হইয়া ‘গোপালের সবই অজ্ঞান অত্যাচার’ বলিয়া মতির স্বপক্ষে ‘স্বায়’ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করে। জাতি-সম্পর্কে গোপাল মতিকে দাড়া বলিয়া ডাকে। ভূমি সম্পত্তি লইয়া এইরূপ বিরোধ হিসাবে ও স্বাভাবিক জাতি শত্রুতার হিসাবে মতি বহু-কাল হইতে গোপালের বন্ধ-বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে যে কিক্রমে গোপালের বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়া সেই শত্রুতার শোধ লইবে, তাহাই দিবানিশি চিন্তা করিতেছিল, সেই চিন্তায় সে উন্মত্তের জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল! এমন সময়ে সূর্য্য সন্ধ্যোগ সমুপস্থিত! মতি আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল।

জনা চাটুষ্যকে কহিল, ‘হরি ঘোষের মায়ের আঁক খুব জাঁকিরে হবে। সমাজ নিমন্ত্রণ করবে, পাঁচ-শ্রীরের লোক জড় হবে—সেই ভোজে পাত পাড়বার সময় হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। ওর ঘরের কথা বার করে হাত ধরে পাতা থেকে উঠিয়ে দেবো।...আমায় বলে বদমায়েস লোক!’

মতি কহিল, ‘তাতে ও জব্ব হবে না, কলকাতায় চলে যাবে। ওকে কাণা করে ঘরে পুরে রাখতে হবে—ওর কাটা ঘায়ে মনের ছিটে দিলে আলাতে হবে—তবে মনের রাগ মিটবে।’

হারু রায় কহিল, 'সে কি পেরে উঠবে? দেশের সব ছোট লোক ওর হাতে। আবার মহকুমার মেজেষ্টার মফস্বলে এলে আগে ওর খোঁজ করে, ব্যাটার সঙ্গে দেখা ক'রে সব পরামর্শ করে। ওকে মারা-ধরা বড় কঠিন কাজ। 'ই' করতে হাজার লোক ওর পিছু হাঝির হয়।'

দলের মধ্যে হরি রায় কিছু ভীক। সে ভীত কণ্ঠে কহিল, 'ও সব কোজদারী হাজামায় দরকার নেই। তার ওপর ওকে পারবে না। খররাতি চিকিৎসার জোরে দেশের সব ছোট-লোক ওর হাতে।'

হারু কহিল, 'শুধু চিকিৎসা নয়, ওষুদ, পথ্য সব খররাতি তারপর আপন বিপদে দেশভক্ত সব লোকের ঘরে সে দাখিল হয়।'

হরি...এধারে দিলটা ভাল, দান ধ্যানও আছে। বরাত গুণে বৌটা আর মেয়েটাও তেমনি হয়েছে।

হরির কথায় মতি বোস তেলে-বেগুনে জলিরা উঠিল। গোপালের সুখ্যাতির কথা তাহার প্রাণে বিবের কাঁটার মত বিদ্ধ হয়। মতি হরি রায়ের পানে তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া উগ্রকণ্ঠে কহিল, 'তঁাবা তুলসী হাতে ক'রে বধন এর পক্ষে সাক্ষী দেবে, তখন ও সব কথা ব'লো। 'ক' টাকা ঘুষ খাইয়েছে বল তো?'

হরি ভীতভাবে সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল, 'না না ভায়া, আমার তানাসার কথাটা বুঝতে পারেন না, আমি হতভাগার বুজকির কথাটা বলছি। কত রকম ভঙ্গি যে জানে আর কতভাবই করে,

ধরে সাধ্য কার। আমি বল্লম এক ভাবে, তুমি কথাটা নিলে
আর একভাবে।’

হরি রায়কে দলের সকলে চিনিত। সে অতি ভীৰু—
অবস্থা অল্পসারে ভাব অনায়াসে বদলাইতে পারে বুদ্ধিমা সকলে
মনে মনে হাসিল। জনা চাটুয্যে কহিল, ‘তোমার মত লোকের
কোন ভাল কাজে থাকতে নেই, ঘরে ঘোনটা দিবে’ ঘুমোতে হয়।’

হরি রায় নীরবে ভীত-চক্ষে ইহার উহার মুখের পানে
চাহিতে লাগিল। তখন জনা চাটুয্যে শব্দই কহিল, ‘হরি তুমি
ঘরের ছেলে ঘরে যাও—কোন কথার খেঁকো না।’ হরিকে
ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, জনার্দন কঠোর কণ্ঠে তাড়না করিয়া
কহিল, ‘যাও যাও, উঠে যাও।’

জনা চাটুয্যের গরিকারক্ত চক্ষু ও কঠোর গর্জনে ভীত
হইয়া হরি রায় উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। বেশী দূর সে
বাইতে পারিল না, একটু আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল—যাহা
শুনিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত হইল।

জনা কহিল, ‘গোপালকে একেবারে শেষ ক’রে দেওয়া
যাক! কথার বলে, রোগের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই।’

জনার প্রস্তাবে হারু রায়, মতি বনু একটু স্তম্ভিত হইয়া
ভাবিতে লাগিল। হারু কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, ‘কথার বলে, ধর্মের
ঢাক বাতাসে বাজে। যদি একটু স্মৃতির আগার বেরিয়ে পড়ে,
তবেই সর্বনাশ! হয় কিসি নয় দীপান্তর!’

জনা সদর্পে কহিল, ‘শাস্ত্রেই বলে, কাপুরুষের বিড়ম্বনা পান-

পায়। ভীকু দুর্বল লোক ঘরের কোণে ব'সে ব'সে পরের পরজার হজম করে—হাজার খাঁটা-লাখী মারলেও তাদের লজ্জা হয় না।'

জনাব কথায় হাক উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'তা বটে। জন্ম-ভায়া ঠিক কথাই বলেছে। চোখ বুঁজে আর গর্ভে পড়ে ঘুমোলে চলছে না। গোপাল বোসের ভারি বাড়ানি হয়েছে; বাড়ানিটা না ভাঙলে আর চলছে না। কথায় বলে, 'বাক প্রাণ থা'ক মান।' বায় প্রাণ বাবে—একে ঠিক করা চাই-ই।'

মতি কহিল, 'ওকে ধনে-প্রাণে মারতে হবে, তার উপায় কি তাই ভেবে ঠিক কর।'

জনা চাটুয্যে তীব্র হাসি হাসিয়া প্রকাণ্ড লম্বা শৌণ্ড জোড়াটার তা' দিতে দিতে কহিল; 'শস্যার মুখ দিগে বাজে কথা কোন কালে বের হয়নি। কাজের জোগাড় না ক'রে আমি মুখের কথা বের করি না। বাশবেড়ের রেসো-বাগ্দীকে না জানে কে? সে অঞ্চলে সে ডাকাতির সর্কার—গুণ্ডার দলপতি। রেসো আমার মুঠোর মধ্যে। সেদিনে শুনেই সে বললে, 'দা-ঠাকুর, তোমার জন্তে হাসতে হাসতে মাথা দেব, কথা রইলো।'

মতি কহিল, 'শুনলেম, তুমিও সেদিন তাকে খুব বাচিয়েছিলে। রেসো রায়গীর রায়দের বাড়ী ডাকাতি করে ফিরবার সময় প্রায় ধরা পড়েছিলো—তাকে পিছু পিছু অনেক দূর তাড়িয়ে এনেছিলো। ধরে ধরে—এমন সময় বনের পথ থেকে বেরিয়ে পড়ে তুমি লোকটাকে ক' কোণে শেব করলে, তাই রেসো বেঁচে গেল।'

জনা সগর্জে কহিল, ‘ক’ কোণ কি? মাহুঘের মাথায় কি আর এক কোণের বেনী লাগে, যদি অস্থানা একটু ধারাল হয়?’

মতি কহিল, ‘রেসোকে নিয়ে কি কববে?’

জনা কহিল, ‘গোপালের বাড়ী ডাকাতি করাবো—তাকে ধনে প্রাণে মারব। ওই শালাই হচ্ছে গাঁয়ের শত্রুর—দেশের শত্রুর।’

রজনী একটু আড়ালে পাড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সে ক্রত পদে আসিয়া কহিল, ‘না না, অতটা নয়। প্রাণে মারতে হবে না। বেনী বাড়াবাড়ী ক’রে শেষটা নিজেদের বিপদ টেনে আনবে। ওর বাড়ী ডাকাতি ক’রে কোন ফল ফলবে না, ওর ঘরে কিছু নেই। মিছে কেবল বিপদ ডেকে আনবে।’

জনা চাটুষ্যে সদর্পে কহিল, ‘বা কিছু ওর ঘরে আছে সব লুটে আনব। অবশেষে আঙা-বাচ্ছা সব-এক-গড় ক’রে কেটে রেখে আসবো।’

জনাব ভাবে, কথার ও কঠিনেরে রজনীর রমণী-প্রাণ থর থর কাঁপিয়া উঠিল। রজনী ভীত কাতর স্বরে কহিল, ‘জনা দাদা, অমন কথাটা আর মনেও তেবো না—মুখেও এনো না। অল্প রকমে সুসমাজে একঘরে ক’রে—কুৎসা বদনাম ক’রে গোপালকে বাতে জ্বল করিতে পার তার চেষ্টা কর—তাতে যত টাকা লাগে, আমি আছি। নইলে, ওসব কুপরামর্শে কুচক্রে আমি নেই

জনা একটু মুচকি হাসিয়া, রজনীর পানে একটু আড়নরনে

সোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

চাহিয়া কহিল, ‘গোপাল শালা বে কি গুণ জানে—চোখে দেখলেই মেরেমাছুব ভুলে যার।’

রজনীও তেমনি হাস্তে তেমনি ভয়ীতে জনার প্রতি চাহিয়া একটু চুপে চুপে কি কহিল—অপরে তাহা শুনিতে পাইল না। হারু, ভয়ীর রসভাবে সুবিধা সুযোগ প্রদানের জন্য বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। জনাৰ্দ্দন ও রজনীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া মতি কহিল, ‘আমি একটু আসি দাদা।’ জনাৰ্দ্দন সদৰ্পে কহিল, ‘ভাল খাবার সময় সব-শালা, আর মাথা দেবার সময় জনা চাটুঘো, কেমন?’

মতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, ‘না দাদা; ধৰ্ম্ম সাক্ষী ক’রে বলছি—মাথার উপর চন্দোর স্থিতি—তুমি বা’ বলবে—প্রাণ পণ ক’রে বলছি, তা ক’রতে এক পা পিছোব না।’

জনাৰ্দ্দন কহিল, ‘হাঁ, থালি ফাঁকা মুখের কথার কাজ মিটবে না। আজ রাত-দুপুরে মা শবাসনার মন্দিরে ধৰ্ম্মঘট করে সব প্রতিজ্ঞা করিতে হবে।’

মতি অত্যন্ত আনন্দভরে কহিল, ‘বেশ কথা—শত্রু নিপাত ধৰ্ম্মেরই কথা। ধৰ্ম্মেরই কথা—ধৰ্ম্মঘটই শাস্তোর বাক্য।’ বলিয়া মতি প্রস্থান করিল। জনাৰ্দ্দন গোপালের কথা তুলিয়া রজনীকে ভৎসনা করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লোকপুরে কলেরা আরম্ভ হইল। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বাগ্দীপাড়া। লোকপুরের বাগ্দীপাড়ার আর হাড়িপাড়ায় এখনও বহু লোকের বাস। নিচুর নির্ধম সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া আজিও এই দুইটা পাড়া কিছুমাত্রও খালি করিতে পারে নাই। এখনও ঐ দুইটা পাড়া লোকজনে মুখরিত। হাজার হাজার হাড়ি বাগ্দী এই দুইটা পাড়ার জীবিত থাকিয়া লোকপুকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। গোপাল এই দুই পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বণিতার প্রাণ-স্বরূপ। গোপালের পারে একটি কাঁটা কুটিলে, তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

সর্বপ্রকার মহামারী দেশের ইতর-পল্লীতেই মূল শিকড় গাড়ে ; কলেরা সর্বপ্রায়ে বাগ্দীপাড়া আক্রমণ করিল। ভোলা বাগ্দী, বাগ্দী-পাড়ার মাথা। পাড়ার মধ্যে তাহার অবস্থাসকলের অপেক্ষা ভাল। এখন বাগ্দীদের সকলেরই অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। পূর্বের সে দুর্দশা এখন আর তাদের নাই। সে হেঁড়া ময়লা কাপড়, কাঁথা আর অনাহারে লীর্ণ শুক মুখ আর তাহাদের মধ্যে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ, তাহারা এখন কাজের লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তেমন জন মজুরি খাটিয়া আট আনা আনিয়া আগেই ছয় আনার তাড়ি খায় না, অথবা একদিন খাটিয়া পাঁচদিন বসিয়া খরশান

টানিতে টানিতে মিছা গাল-গলে কাল কাটায় না। এখন তাহারা দিন-ভোর পরিশ্রম করে। পরের ঘরে মজুরি করে, আপন ঘরে চাস-বাস তরকারি-পাতি করে। উৎপন্ন ফসল নিজেরা সুখে ভোগ করে—অবশিষ্ট অংশ গ্রামের হাটে-বাজারে বিক্রয় করে। তাহাদের খাওয়া পরা চালচলন আর সাবেক রকম মরলা অপরিষ্কার নাই। বিশেষতঃ রাতে তাঁত চরকা চালাইয়া তাহারা খদ্দেরের কাপড়, চাদর, জামা, বিছানা পর্যন্ত পর্যাপ্ত ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। শারীরিক খাটুনি খাটিয়া বে সময় টুকু বাঁচাইতে পারে, সেটুকু লেখা পড়ার চর্চায় আনন্দে কাটাইয়া দেয়। যখন কালীদাসী মহান্তারত ও কীর্তিবাসী রামায়ণ শ্রব করিয়া পাঠ করিতে করিতে তাহারা রাম বৃষ্টিবিরের নীতি ধর্ম, লক্ষণ ও ভীমাঙ্কুরের বৈধ্য বীধ্য পরম্পরকে বুঝাইয়া দেয় ও আলোচনা করে, তখন ইহসংসারেই তাহারা স্বর্গস্থল উপভোগ করে। শতমুখে পাঁজা-তাড়ি ও মদের নেশায় নির্জিবাদে হৃদয়ের অহুতাপ উদ্গীরণ করিতে থাকে। এক কথায় পূর্বে তাহারা মানবদেহ, মানবজীবনকে যেমন অতি অসার ভুজ্জ সামগ্রী বোধে অনায়াসে মরণকে বরণ করিতে পারিত, এখন আর তাহা পারে না। এখন হাসিমাখা-স্রী-পুত্রের মুখশুলা লইয়া সুখের সংসারকে খুব দামী বলিয়া অহুভব করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্তন ও শিক্ষা দীক্ষার মূলীভূত কারণ, গোপালের অদম্য উত্তম ও সহাজ্জুতি। গোপালের উন্মোগ বহু ও চেষ্টায় লোকপুত্রের হাড়ি-পাড়াও এখন ভজ-পন্নীতে পরিণত

হইয়াছে। এখন তাহাদের মধ্যে অনেকে ধবরের কাগজ পড়ে, দেশের কথা সমাজের কথা আলোচনা করে—এমন কি বাংলার বাবুদের মত কংগ্রেসের আন্দোলন লইয়া আপনাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক করিতে 'ছোট মুখে বড় কথা' বলিতে আর এখন আর লজ্জা বা কুষ্ঠা বোধ করে না। তাহাদের দেখাদেখি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামের ইতর লোকেরাও অমুহুরণ করিয়া 'ভদ্র' হইয়া উঠিল দেখিয়া দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও ব্যবসায়ী—তিলি তাহুলি ইত্যাদি ধনী সম্প্রদায় অত্যন্ত কুপিত ও ইর্ষান্বিত হইয়া গোপাল ও তাহার দলবলকে অভিশপ্ত করিতে আরম্ভ করিল। দেশ ব্যাপিয়া কথা উঠিল, 'কানী বোসের ছেলে গোপাল বোস দেশটার মাথা খেলে। কুলি-মজুর মিলবে না, আপনাদের মাথায় মোট বইতে হবে। হাতে লাঙ্গলের মুট ধরে চাষবাস করতে হবে।' আরও জাত্যাভিমানী সম্প্রদায় এইরূপ নানা ভাবের নানাকথা বলিয়া—তদুপরি নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে এবং গোপাল, প্রবোধ প্রভৃতির দলকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারা যখন খুব বেশী রকম পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দুই একজন ছাড়া, প্রবোধ প্রভৃতি যুবকদল দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় পলায়ন করিল। গোপাল অটল অচলভাবে সমান উত্তমে কাজ চালাইতে লাগিল। তাহার 'নাইট-স্কুল' আরও অধিক রাত্রি পর্যন্ত চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার ফলে এই দাঁড়াইল—গোপাল বসু যতই দেশের ভদ্র

লোকদিগের বৈরী ও অশ্রিয় হইতে লাগিল, ততই সে ছোট লোকদিগের প্রাণের দেবতা হইয়া উঠিল। তাহারা সত্যই স্বর্গের দেবতা জানে গোপালকে প্রাণের পূজা প্রদান করিতে লাগিল। গোপাল যেন তাহাদিগের জন্মদাতা পালন কর্তা পিতা ও গোপালের পত্নী 'নয়নমণি' তাহাদের গর্ভধারিণী জননী হইয়া দাঁড়াইল। হাড়ি-বাগ্দী-পাড়ার কাহারও ক্ষেতে একটি নূতন বেগুন বা কাহারও কলাগাছে কলা ফলিলে, দেবতা ব্রাহ্মণকে না দিয়া তাহারা নূতন ফলটি লইয়া মহা আনন্দভরে ছুটিয়া সর্বাগ্রে গোপালের ঘরে দিতে আইসে। নয়ন লইতে অনিচ্ছা বা কুর্গা বোধ করিলে তাহারা প্রাণের মধ্যে দারুণ আঘাতের বেদনা অনুভব করে। অগত্যা গোপাল, তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি অর্থ ছই হাতে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের বুকভরা ভালবাসার প্রতিদান—আলীকাদে পরিতৃপ্ত করিত।

ভোলা বাড়ীতে এক ছেলে। ভোলা কয়দিন পূর্বে খুব জাঁক জমকে ছেলের বিবাহ দিয়া নূতন বৌ ঘরে আনিয়া সংসার সার্থক ও জীবন ধন্য করিয়াছে। ভোলা একমাত্র ছেলেকে রাত্রি ছই প্রহরের সময় কলেরা আক্রমণ করিল। ভোলা ছুটিয়া গোপালের বাড়ী আসিল, পাগলের মত বকিয়া, গোল করিয়া গোপালকে ডাকিল। ভোলা গোল গোপালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গোপাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ভোলা নুখে সংবাদ শুনিয়া কহিল, 'ভোলা-দা, তুমি ঘরে যাও, আমি ডাক্তার নিয়ে এখনই যাব।'

গোপাল গ্রামের ডাক্তারকে লইয়া অতি সম্বর ভোলায় বাড়ী আসিল। সমস্ত রাজি জাগিয়া গোপাল ভোলায় ছেলেকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইতে লাগিল। একটু বেলা হইলে বিজন প্রভৃতি কয়টি ছাত্র আসিয়া গোপালকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা ভোলায় ছেলের চিকিৎসা সুস্রবা চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাঙ্গী-পাড়ার আরও কয় ঘরে কলেরা দেখা দিল। গোপাল ডাক্তার লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

কলেরার আবির্ভাবে বাঙ্গী-পাড়ার মেয়ে পুরুষ সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। গোপালকে দেখিয়া তাহারা মৃত দেহে জীবন লাভ করিল। তাহাদের মনে হইল, যেন কোন স্বর্গের দেবতা তাহাদের বিপদরাশি দুই হাতে তাড়াইবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। গোপাল বহু চেষ্টা করিয়াও সকলকে বাচাইতে পারিল না। গ্রাম পঁচিশটি রোগীর মধ্যে পাঁচটি মারা পড়িল। অবশিষ্টগুলি যে বাচিয়া উঠিল সে কেবল গোপালের যত্ন ও শুক্রবার ফলে। ভোলায় বড় সাধের একমাত্র ছেলেটি মারা পড়িল। ভোলায় স্ত্রী ঘন ঘন মূর্ছিতা হইতে লাগিল, ভোলা পাগলের স্রাব অধীর হইয়া মাটিতে মাখা খুঁড়িতে লাগিল। বাঙ্গী ও হাড়ীপাড়ার উন্নতিকল্পে ভোলা গোপালের দক্ষিণ হস্ত। সেজন্য গোপাল দুপুর রাতে জলে ডুবিতে বলিলে ভোলা সেই মুহূর্তেই ডুবিয়াছে। গোপাল ভোলায় প্রাণের দেবতা। গোপাল ভোলাকে সবলে কোলের মধ্যে ধারণ

করিয়া প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিল। গোপাল কহিল, ভোলা-দা, জানই তো, জন্ম মৃত্যু সবই ভগবানের হাত। এখানে যতদূর সাধ্য ততদূর চিকিৎসা করানো হ'য়েছে—সেজন্য তোমার দুঃখের কারণ নেই। ভগবানের জিনিষ ভগবান নিলেন এই ভেবে এখন মনকে বুঝাও। ওষুদে ও ডাক্তারে যদি মরণ বন্ধ হতো, তা হলে মহারাণীর ছেলে মরত না। বার বারখন সময় ফুরোবে তাকে তখন যেতেই হবে। কালের মুখ থেকে অন্ন ভগবানও ফিরিয়ে নিতে পারেন। মহাত্মারতে পড়েছ ত, অর্জুনের মত ক্ষমতা মানুষের মধ্যে নেই, আর শ্রীকৃষ্ণ অন্ন ভগবান। সেই অর্জুনের ছেলে—আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের' ভাগ্নে অভিমুখ্যর অকাল-মৃত্যু তো কৈ বন্ধ হলো না!' গোপালের প্রবোধ বাক্যগুলি তড়িৎশক্তির স্তায় ভোলার মৃতপ্রায়-প্রাণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সজীব করিয়া তুলিল। গোপালের প্রাণপণ চেষ্টায় বাগ্মী-পাড়া হাড়ি-পাড়া প্রভৃতি ইতর পন্নী হইতে কলেরা বিদূরিত হইল। তথাকার অধিবাসীগণ সুস্থ সবল হইয়া গোপালের নিকট চিরঞ্জী—চিরকৃতজ্ঞ রহিল।

অন্তিম পরিচ্ছেদ

লোকপুরে এক মহাসমারোহের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে ! হরিষ বোম্ব তখন তথাকার একজন খুব বড়লোক । হরিষবাবু নানারকম ব্যবসা ও কন্ট্রাক্টরী কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন । তাঁহার পুরাতন ভাঙ্গা খড়ো-ঘরের বায়গায় এখন প্রকাণ্ড অট্টালিকা মাথা খাড়া করিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে । অট্টালিকার বাহির-অংশ ও মধ্যভাগে অতি সুন্দর মার্বেল-প্রস্তুত-মণ্ডিত পুজার দালান । দালানের দুই পার্শ্বে দুই বৈঠকখানা । বৈঠকখানা দুইটি নানা রকমের কোচ, কেদারা, আরনা, ছবি ইত্যাদিতে পরিশোভিত । পুজার দালানের সম্মুখে অতি প্রকাণ্ড ইষ্টক-সিমেন্ট-বানান অঙ্গন । হাজার-দেড় বা ততোধিক লোক অনায়াসে সে অঙ্গনে বসিয়া ভোজন করিতে পারে । সেই বৃহৎ অঙ্গন আজ বহুলোক পরিপূর্ণ । অঙ্গনের উপরিভাগ নীলবস্ত্র-চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইয়াছে ! তাহাদের বৈঠকখানার একটিতে বহু প্রাচীন লোক, নানা বর্ণের ত্রিবিচিত্র গালিচা-ছলিচা-মোড়া চৌকিতে উপবিষ্ট । তাহাদের মধ্যে কতগুলি বিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তি হরিষবাবুকে ঘেরিয়া অশাচিত্ত অমূল্য উপদেশ—পরামর্শ প্রদান করিয়া কর্মকর্তাকে কৃতার্থ করিতেছেন । হরিষবাবুর মাতৃ-শ্রাদ্ধ । মহাসমারোহে দানসাগর

ক্রিয়া! তদুপলক্ষে হরিষবাবু বিদেশে কর্মস্থল হইতে বহুকাল পরে গৃহে আসিয়াছেন।

বিজ্ঞ বৃদ্ধগণের গ্রাম্য-পণ্ডিত প্রসিদ্ধ শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, ‘হরিষ, ভগমানের কৃপায় তোমার অবস্থা এখন খুবই ভাল। তুমি পিতৃ মাতৃভক্ত অতি সচ্চরিত্র ব্যক্তি। পিতা মাতা লোকের একবারই মরে। সাধু-শাস্ত্রে বলে, ‘সকল ঋণ শোধ হয়, মাতৃঋণ শোধ হয় না!’ মাতৃশ্রদ্ধ উপলক্ষে পিতৃ প্রদানে আর ভুরিভোজনদানে সে মহাঋণের আংশিক পরিশোধ সম্ভব। মাতৃ আশীর্বাদে কমলার কৃপায় তুমি জীবনে সে শুভ সুযোগ লাভে সমর্থ হয়েছ। এমন সুযোগ হেলায় হারিও না বাপু।’

হরিষবাবু সত্যই অতি সৎপাত্র। হরিষবাবু অতি সামান্ত অবস্থা হইতে অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা বদলাইয়াছে, কিন্তু মতিগতি চালচলন কিছুমাত্র গরম হয় নাই, একইরূপ নরম আছে। হরিষবাবু চিরদিনই দীনভাবাপন্ন সদাশয় ও বিনীত। শিরোমণি মহাশয়ের কথায় হরিষবাবু বিনীত কর্তে কহিলেন, ‘আপনারা মহাত্মা মহাজন। আপনাদের শুভ আশীর্বাদ অবশ্যই সফল হবে। আমি তো এখন বিদেশী—বিদেশবাসী। আপনারা দয়া ক’রে দেখা শুনা করুন, যাতে কাজ হয় তার ব্যবস্থা করুন।’

শিরোমণি কহিলেন, ‘তোমার মাতাঠাকুরাণী মহা পুণ্যবতী ছিলেন। তাঁর কাজ সূচাক্রমেই সম্পন্ন হবে তাতে আর

স্নেহ কি? তবে তুমি একটা কাজ কর বাপু।' হরিষবাবু করবোঁড়ে কহিলেন, 'আজ্ঞা করুন।'

শিরোমণি... 'তুমি' দীর্ঘ বাঁড়ুঘ্যেকে একত্র করো। দীর্ঘ দেশের অনেক কাজে কর্তৃত্ব করেছে। সে বড়লোকের ছেলে, নিজের অনেক বড় কাজ করেছে। দীর্ঘ তোমার এ বৃহৎ কাজ খুব ভাল ভাবেই সমাধা ক'রে দেবে।'

নারায়ণ রায় গ্রামের বনিয়াদী বংশের লোক। তাঁহাদের বাড়ীতেও পূর্বে বহু বড় বড় কাজ কর্ত্ব হইয়া গিয়াছে। এখন আর রায়বংশের তেমন অবস্থা নাই—তেমন কাজ কর্ত্বের অলুচানও নাই। ভাল-পুকুরের ভাল আর নাই—আছে মাত্র নাম। রায় মহাশয়দের নাম, মাত্র নামে আছে—কাজে আর কিছুই নাই। বাস্তবিক যখন বনিয়াদি বংশের অর্থগত কার্যগত শক্তি বিনষ্ট হয়, তখন তাহার আভিজাত্যের অভিমানটা সন্তোষে ফুটিয়া উঠে। শিরোমণি মহাশয় রায়দের নাম করিলেন না। দীর্ঘ বাঁড়ুঘ্যেকে বাড়াইয়া বড় করিলেন। তাঁহার কথাটা, গ্রামের বনিয়াদি বংশের লোক নারায়ণ রায়ের প্রাণে বড় বাজিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, 'কাজ তো করবেন, কিন্তু কাজ হবে কি ক'রে?'

গ্রামের অন্য জনৈক প্রৌঢ় কৈলাস হালদার, নূতন বড়লোক হরিষ ঘোষের মোসাহেবী উমেদারী করিতেছে, সে সঙ্গে সঙ্গে গর্জিয়া কহিল, 'কেন? কাজ হবে না কেন? কে আটক করবে এ কাজ? এ তো যে সে লোকের বাড়ীতে যে সে কাজ

নয়! এ কাজে কে বাধা দিতে পারে—কার বাপের ঘাড়ে ক'টা মাথা?’

নারায়ণ রায় কহিলেন, ‘গাঁয়ে যে দলাদলির খোঁট উঠেছে, তাতে কাজ যে সূচাক্রমে সমাধা হয়, এমন তো মনে হয় না।’ হরিষবাবু ভীত হইলেন, ভীতকণ্ঠে কহিলেন, ‘আমার দূরদৃষ্ট! এমন আমি মহাপাপী, আমার কাজ সহজে সকল হবে কেন?’

শিরোমণি সদর্পে কহিলেন, ‘কে বলে দলাদলি? কেন, কি ঘটনা কোথা ঘটেছে যে গাঁয়ে একটা দলাদলি ঘটবে?’

যহু রায়, নারায়ণ রায়ের অপেক্ষে ও সবাংশের লোক। যহু গর্জিয়া কহিল, ‘সে দেখে নেবে। যখন ঘটবে, তখন দেখে নেবে সব, কেন—আর কোথা থেকে কি ঘটলো।’

শিরোমণির চতুষ্পাণীর ছাত্র করজন ক্ষীত বক্ষে ক্ষীত কণ্ঠে কহিল, ‘হাঁ হাঁ! দেখা যাবে কে কি করে!’

যহু কহিল, ‘দেখার আগে সাবধান হওয়াই ভাল, রুতীর অর্ধনষ্ট আর লোকের মনকষ্ট—কথাটা তো ভাল নয়! এত টাকা খরচ হবে, শেষটা যদি কার্য্য পণ্ড হয়, তবে দুঃখের পরিসীমা থাকবে না।’

হরিষবাবু কাতর কণ্ঠে কহিলেন, ‘তবে আপনারা আমার অহুমতি করুন, আমি গঙ্গাতীরে যে কোন রকমে মায়ের পিণ্ড দান করি।’

শিরোমণি একটু চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিতে ভাবিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেন? হয়েছে কি, ব্যাপারটা কি এমন

ঘটলো যে, গাঁয়ে এমন সময় একটা দলাদলি বাধবে? কে বাধাবে? হরিষ অতি সজ্জন ব্যক্তি। গাঁয়ের কেন—দেশের বাতে মঙ্গল হয় সে জন্ত হরিষ বহু টাকা মুক্ত হস্তে দান করছে। ভগবান তাকে যেমন দিয়েছেন, তেমনি অর্থের সদ্যবহারও সে সর্বক্ষণ করতে প্রস্তুত।’

খোসামুদে কৈলাস হালদার উচ্চৈশ্বরে কহিল, ‘এই সেদিনে সাধারণের রাস্তা মেরামতের জন্ত বাবু অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকার চেক কেটে দিলে। গাঁয়ের লাইব্রেরীর জন্ত পরশু পাঁচশ টাকার বই কিন্তে দিলেন। তা’ছাড়া গোপনে যে কত—সে আর কত মুখে কত বলব? কত অনাথা বিধবার অন্ন বস্ত্র দান করছেন বাবু, তা তো চথের মাথা খেয়ে ব্যাটা-বেটীরা দেখতে পার না! এমন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির বাড়ীতে এত বড় একটা ক্রিয়া উপলক্ষে যে-ব্যাটা গোলযোগ উপস্থিত করবে, ভগবান নিশ্চয়ই তার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত করবে।’

শিরোমণি কহিলেন, ‘একটু স্থির হও। এখন তোমরা কেউ কোন রকম গোলমাল ক’রো না। আমাদের ভিতরি-ভিতরি সব আগে জানতে দাও, আর কোন কথাই এখন প্রয়োজন নাই।’ এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয়, হরিষবাবুর অসাড় হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। অপর সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন।

নারায়ণ রায় ও বহু রায় উচ্চৈশ্বরে নানা কথার আলোচনা

করিতে করিতে প্রস্থান করিল। হরিষবাবুর উৎকর্ষ ভবন নীরব—নিরানন্দময়।

বাহিরে গরীব লোকেরা দল বাঁধিয়া স্থানে স্থানে আড্ডা করিয়া হরিষবাবুর বাটীর প্রাঙ্গণ উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দ উৎসাহ ভরে কহিল, ‘ভারি ঘট! দান সাগর প্রাঙ্গণের এমন কাণ্ড এদেশে কেউ দেখেনি—শোনেনি। গোরামিস্ত্রি লুচি ভাজবে!’ এইরূপ নানাভাবে নানা কথা কহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

লোকপুত্রের জেলে-ঘাটে মেয়েদের একটা খুব বড় মজলিস্। পশ্চিম-গগনে সূর্য্য হেলিলে গ্রামের অনেক মেয়ে, যুবতী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধা কক্ষে কলসী লইয়া—ঘরে কলসী-ভরা-জল ফেলিয়া জল স্নানিতে এই জেলে-ঘাটে আসে। গল্প-গুজবে, পরচর্চায়, পরের কথার আনন্দ উপভোগই উদ্দেশ্য—জল আনাটা অছিল। বিশেষতঃ, গ্রামের নূতন বড়লোক হরিষবাবু মাতৃপ্রাঙ্গণ উপলক্ষে বাড়ী আসা অবধি মেয়েঘাটের মজলিস্ বেশী রকম জমিয়াছে। হরিষবাবুর বাড়ীর বৌ ঝি নানা বেশভূষায়—নানা অলঙ্কারে সাজিয়া সন্ধ্যার আগে এই ঘাটে আসে আর হাত মুখ চোখ

নাড়িয়া নানা ছাঁদে নানা কথা বলে। তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বামীর সঙ্গে নানা স্থানে বাসার বাসায় ঘুরিয়া থাকে—অনেকে বর্তমান বঙ্গের বিলাস-সভ্যতার কেন্দ্র কলিকাতায় বাস করে। তাহাদের মুখের বহু ভাবের বহু কথা শুনিবার ক্ষমতা, বহু রকমের তাবডমী দেখিবার ক্ষমতা, লোকপুত্রের অনেক মেয়ে—যাহারা সচরাচর এ ঘাটে আসে না, তাহারাও আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে জেলে-ঘাটে—দেখিতে দেখিতে অনেক মেয়ে উপস্থিত হইল। হরিষবাবুর বাড়ীর অনেক মেয়ে, বউ আসিয়া ঘাটের মেয়ে-মজলিসে যোগদান করিল। অনেক নূতন বো, ঝি ইত্যাদি করিয়া তাহাদের বসন ভূষণের বৈচিত্র্য-বাহুল্য দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বামী হাকিম, কেহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ মুনসেফ, কাহার স্বামী উকীল। হাকিমের যাহারা পত্নী, তাহারা হাকিমী-চালচলনে মেজাজ খুব ভারী করিয়া ছুই একটা কথার অমূল্য রত্ন নরলোকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যে ভাগ্যবতী পল্লী-রমণীর পানে চাহিয়া তাঁহারা কথা কহিলেন, তাহারা আপনাতিকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিল। যখন স্বদেশিনী ও বিদেশিনীগণের নানা কথায় মেয়ে-মজলিস ভরপুর জমিয়া উঠিল, তখন মড়ার মত জড়সড় হইয়া স্থলিত চরণে ভয়প্রাপ্ত নয়ন ঘাটে আসিল। ঘাটের একপাশ হইতে জল লইয়া নয়ন সম্বর দ্রুতপদে প্রস্থানের উপক্রম করিলে, রজনী ঘাটে আসিল। রজনী একাই একসহস্র। ঘাটে পৌঁছিবার

পূর্ব হইতেই সে উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার উচ্চ কথায় ঘাট ভোলপাড় হইয়া উঠিল। তাহার দর্পে ও রবে আর সকলের স্বর ও কথা ডুবিয়া গেল। রজনী গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া কহিল, ‘বড় শুভক্সণে হরিষ-কাকার বাড়ী ধুমধামের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এ শ্রাদ্ধে আর এক মহাপাপীর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হয়ে যাবে।’

হরিষবাবুর বড় বৌ, রজনীকে চিনিতেন। সবজাস্তা রজনীকে কেবল লোকপুত্র নয়, পার্শ্ববর্তী আরও আট দশখানি গ্রামের লোক পর্য্যন্ত ভালরূপেই জানিতেন। কলে রজনী, নিজ গুণে নিজ শক্তিতে দেশমধ্যে আপনাকে বিলক্ষণ অহির করিয়া তুলিয়াছিল। রজনীকে দেশের সকল সৎ-সাধু ব্যক্তি ভয়ও করিত, ঘৃণাও করিত। গ্রামের সাধ্বী রমণীগণ রজনীকে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে কাঁপিতেন। বাঘ দেখিলে কুরঙ্গিণী যেমন ভীত চকিত হইয়া উঠে, রজনীর সম্মুখে পড়িলে তাঁহাদের সেই দশা ঘটিয়া দাঁড়ায়। রজনী কি বলিতে কি বলে—কাহার নামে কি কুৎসা কলঙ্কের অপবাদ রটনা করে—এই ভয়ে তাঁহারা সর্বক্ষণ কাঁপিতেন। হরিষবাবুর বড় বৌ—বড় লোকের বধু হইলেও মনে মনে রজনীকে ভয় করিতেন। বড় বৌ—বহুদিন পরে দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন। রজনীকে ঘাটে দেখিয়া তিনি তাহাকে মদলামদল জিজ্ঞাসা করিবার আগেই রজনী পরের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিল। দেখিয়া বড়বৌ উৎকণ্ঠিত হইলেন, ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কার শ্রাদ্ধ রজনী?’

রজনী কহিল, ‘বল্লম বে, একটা মহাপানীর জাক এই সঙ্গে হবে।’

ঘাটের সকল মেয়ে রজনীর কথায় স্তম্ভিত হইল। তাহারা চকিত নয়নে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাঘী করিতে লাগিল। বড় বৌ কহিলেন, ‘তোমার কথা তো ভাল বুঝতে পার্ছ না রজনী।’

রজনী উগ্রকণ্ঠে কহিল, ‘কেন? লোকে কি জানে না? দেশের কোন লোকটা সে কথা শোনেনি—কোন লোকটা তা’ জানে না?’ বড় বৌ কহিলেন, ‘আমরা তো দেশে থাকি না, দেশের খবর কি করে রাখবো বাছা?’ নয়ন আগেই রজনীর ভাব—রজনীর কথার ভাব বুঝিয়াছিল। সে ক্ষতপক্ষে গ্রহণ করিল। কুৎসা, পরনিন্দা-প্রিয়া রমণীরা রজনীকে উৎসাহ দিয়া কহিল, ‘কথাটা খুলেই বলনা, রজনী দিদি! সত্য কথা বলতে ভয় কি?’

রজনী তাহাদের কথায় আরও উৎসাহিত হইয়া কহিল, ‘ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বাজে। দশমুখে ধর্ম্ম—দশজনেই বলছে। গোপাল বোসের বাড়ীর কাণ্ড কারখানা—কেলেঙ্কারী কে না জানে? কে না বলছে? তাই তো রায়ে এত গোলমাল উপস্থিত হয়েছে। সকলেই বলছে, ‘গোপাল বোসকে একঘরে করতে হবে। তাকে নিয়ে আর সমাজে বসে খাওয়া হবে না।’

রজনীদেবী প্রায় রজনীর সমকক্ষা—সমজাতীরা। সে একটু মুচকি হাসি হাসিয়া কহিল, ‘তা অত বাড়াবাড়ি করে সমাজ মানবে কেন?’

রজনী উচ্চকণ্ঠে জেলে-ঘাট ভোলপাড় করিয়া কহিল,

সোল একেণ্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

‘বলবো কি’ রক্ত-দিদি, দিনে দুপুরে ছোড়াগুলোকে নিয়ে যে কাণ্ড ক’রে—ছিঃ ছিঃ, তন্দর লোকের ঘরে—বামুন কায়েতের ঘরে—এমন সর্ব্বনেশে কাজ—গলায় দড়ি! ছিঃ ছিঃ, দেগবে, শ্রাক-ভোজের দিনে কি কাণ্ড হয়!’

চরিত্রবাবুর বড় বোঁ কথাটা শুনিয়া বড় চিন্তিত হইলেন। তিনি কহিলেন, ‘তাই তো রজনী, তোরা পাঁচজন থাকতে সেই দিনে গগুগোল বাধবে? আমরা তো দেশে থাকি না। কত দিন পরে এই ক্রিয়া উপলব্ধ ক’রে দেশে এলেম। ভাবলেম, এমন কাজটা আপন দেশে করাই ভাল। দশটা আপনার লোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ লোক-লোকতা করা হবে। দেগতে শুনতে সব দিকেই ভাল। তা এমন হলে এখানে কাজ বন্ধ করতে হয়। গাঁয়ের যে এমন কপাল পুড়েছে তা জানলে কি আমরা দেশে আসতেম, না গাঁয়ে এ কাজের উদ্যোগ করতেম। পোড়া লোকে আর সময় পেলেন না? আমাদের বাড়ীর কাজের সময় তাদের যত মনের ময়লা জেগে উঠলো!’

রজনী ক্রুদ্ধা কণিণীর ভায় গর্জিয়া কহিল, ‘লোকের দোষটা হ’লো কি? যে দোষী তাকে কিছু বলবে না, নির্দোষীকে নিয়ে টানাটানি! নইলে আর কালটাকে ‘কলি’ বলবে কেন? হায়রে ধর্ম্ম! কি দশাই দেশের হয়েছে! এমন দেশে কি থাকতে আছে? না না, কখনই না। দেশ ছেড়ে চলে যাবো, আগে কাজটা মিটে যাক। দেখি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! তারপর এর ব্যৱস্থা করবোই করবো।’

রঞ্জিনী কহিল, 'তা বটেই তো। যার বা মনে আসবে সেই তা করবে, আবার তাদের সঙ্গে—তাদের হাতে খেলে তাতে হিড়র জাতজন্ম থাকবে কি করে?'

সধবা অবস্থায় রজনী বাগ্মী-পাড়ার ছইটা যুবককে লইয়া একবার বহুদিনের জন্ত রাস দেখিতে গিয়াছিল। সেই কথা ঈঙ্গিত করিয়া তেজধিনী মোহিনী দেবী কহিলেন, 'কেন? কথাটা কি? গোপাল বোস কি এমন কুকাছটা করেছে? তার মেয়ে, বউ কি কেউ বেরিয়ে গেছে? কত লোকের বো যে ছলে-বাগ্মী নিয়ে রাস দেখতে যার—আবার বাইরে গিরে রাস-লীলাও করে আসে, তাদের কে কি করে? কে কি বলে? বত চোরদারে ধরা পড়লো গোপাল বোস আর তার বৌটা! তারা 'কি না নেহাৎ ভাল মানুষ। দেশের হিত হয় কিসে তাই নিয়ে ঘুরে মরে—তাই তাদের বত শত্রু! ও, কালের কি ধর্ম!'

রজনী তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিল। সে প্রচণ্ড উগ্রমুষ্টি ধারণ করিয়া কহিল, 'তা দেখা যাবে সেদিন কে তাকে রক্ষা করে! দেশের লোক একসঙ্গে জমবে—সমাজের সব লোকই তো আসবে—বিচারে কি হয়, কি লাড়ায় তা দেখা যাবে। কার শাখা, কার ঘাড়ে সাতটা মাথা তাকে রক্ষা করে সেদিন, সেইটে একবার বুঝে নোব।'

হরিষবাবুর বড় বো ভীতা হইলেন। তিনি কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিলেন, 'দেখ মা রজনী, তোমাদের হাতে ধরে বলছি, এ

সময়টা আর কেউ কিছু কোরোনা। এবারে আমাদের মুখ চেয়ে সবাই চূপ করে থাকো। আর না হয় বোলো, আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাই।’

মোহিনী দেবী চিরদিনই স্তায় ও ধর্মের পক্ষে মুক্তকণ্ঠে কথা কহিয়া থাকেন। অন্তায় অত্যাচার তিনি কোনকালেই নীরবে সহিতে পারেন না। লোকে সেজন্য তাঁহাকে ‘কর্কশ-ভাবিনী’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। মোহিনী দেবী বড় গলা করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, ‘বেশ তো, দেখা যাবে কে গোপাল বোসের কি করে ? আহা, বেচারী দিন রাত মাথা ঘামাচ্ছে, কিসে দেশ ভাল হয়—কি উপায়ে ছোট বড় সবাই সুখে থাকতে পারে। আহা মানুষ তো নয়, যেন সদানন্দ পুরুষ—স্বর্গের দেবতা। সদাই বাড় হেঁট—কত নরম, কত শান্ত ! তারই অনিষ্ট চেষ্টা—ওঃ ! পল্লফুলে বজ্রাঘাত ! দেশ যে উজ্জ্বল যাবে। এমন দেশ যে জলে পুড়ে মরুভূমি হয়ে যাবে !’

এই বলিয়া মোহিনী দেবী জল লইয়া ক্ষতপদে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ অপর সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন। কেবল রজনী—রজনীকে লইয়া মতলব ও পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। রজনী কহিল, ‘তুমি বাড়ীতে ঠিক থেকো। মনে রেখো, রজনী এখনও মরেনি। অন্ত লোক টাকা খরচ করবে, রজনী একেবারে মরে থাকবে না।’

হরিপুরের কালীবাবুকে হাত কয়ে, কোথাকার গোপাল বোস একপাশে মরে থাকবে। একশ টাকা কালী বাবুর হাতে গুঁজে

১১৪নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা

দিলে—সে-ই সমাজ ঠিক ক’রে নেবে। গরীব হ’লেও এখনও তার বংশ-মর্যাদা একেবারে চাকেনি, এখনও সমাজের অনেকে তাকে মানে—চেনে।’ এই বলিয়া রঙ্গিনীর পানে চাহিয়া একটু কটাক্ষ করিয়া মুচকি হাসি হাসিয়া রঙ্গনী কহিল, ‘কাশীবাবু আমা-দেরই হাতের লোক। প্রায়ই আমার বাড়ী বাওয়া আসা করে।’

রঙ্গিনী কহিল, ‘না ভাই, এ বড় অসহ-অপমান। প্রাণ থাকতে এ অপমান সহিবে না। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। টাকা লাগে তাতে আমিও পিছোবো না। আমরা নেহাত আজও মরিনি দিদি।’

রঙ্গিনীর স্বামী ভেজারতি মহাজনী কারবার করিয়া—লোকে বলে, বিশ পচিশ হাজার জমাইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

হরিশবাবুর মাতৃশ্রদ্ধ উপলক্ষে বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। সমাজের সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উত্তরগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে, অসংখ্য কাড়ালী সমাগত হইয়াছে। কালী, কাকী, জাবীড়, নবদীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পণ্ডিত বহু শিষ্য লইয়া আসিয়াছেন। বাহির বাটিতে বসিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের কথা তুলিয়া পরস্পর

তর্কযুদ্ধে বিভোর—আত্মহারা। বাজীর বাহিরে কাঙালীগণ স্থানে স্থানে দল বাধিয়া চীৎকারে গগন কাটাইতেছে। তথ্যদারগণ নানাভঙ্গিতে নানাধরে গান গাহিয়া স্বর্গ হইতে পুষ্প-রথ আনিয়া হরিষবাবুর মৃত জননৌকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গ্রামের নানা স্থানে নিমন্ত্রণ বাড়ীর অন্তরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বসিয়া ধূমপানসহকারে কত খোসগল্পে মাতিয়া কর্মবাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কর্মকণ্ঠা মহাপণ্ডিত বিজ্ঞ-প্রবর শিরোমণি মহাশয় চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতেছেন ও হস্তবদনে মিষ্টবাক্যে সকলকে আপ্যায়িত ও পরিতুষ্ট করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে আসিয়া সকলকে সর্বপ্রকার দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কর্মী হরিষবাবু অতি বিনীত ভাবে করযোড়ে শিরোমণি মহাশয়ের পিছু পিছু ঘুরিতেছেন। ‘ক্ষমা করবেন’ ‘দয়া করে মার্জনা করবেন’ বলিয়া সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। বেখানে কতকগুলি লোক একত্র জুটিয়া চুপে চুপে কোন কথা কহিতেছে, সেইখানেই শিরোমণি মহাশয় হরিষবাবুর সহিত দ্রুতপদে অতি ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে শাস্ত সংঘত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। বাড়ীর পশ্চিমে বড় বড় চালাঘরে বামুন ঠাকুরের দল বাঁকড়া মানভূম জেলা হইতে আসিয়া লুচি, কচুরি, নানারকমের মিঠাই, সন্দেশ, তরকারি পাক করিতেছে ও সুবিধা সুযোগ বুঝিয়া বাটি-বাটি ঘটি-ঘটি ঘি, ময়দা সরাইবার যোগাড় করিতেছে

ও ধরা পড়িবার ভয়ে ভীত চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে। তাহাদের কেহ কোনরূপ কার্যে অবহেলা বা চৌর্য্য অপরাধে ভৎসিত কিম্বা অপমানিত হইয়া আপনাদের গুরুত্বপরম্পরাগত কুলমর্য্যাদার অভিমান করিয়া আর্শনাদ করিতেছে। ভাঙার ঘর বহু রকমের প্রচুর খাচ্ছদ্মব্যো ভরপুর হইয়া, ক্ষুধার্ত্ত ঔদরিকগণের সতৃষ্ণ দৃষ্টি ও লোলুপ রসনা—অতি তীব্র ভাবে আকর্ষণ করিতেছে। হরিষবাবুর বাটী তিন মহলে বিভক্ত। সর্ব্ব পশ্চাতে রত্নন মহল। রত্নন মহল আজ মহিলাগণের কর্ত্তব্যে ও কথাবার্ত্তার মুখরিত। পাকশালার মধ্যে পাক-ফ্রিয়ার পরিপক্ব অভিজ্ঞা গৃহিণীগণ বিবিধ অন্ন-ব্যাঞ্জন পাকে নিরতা। বাহিরে, অন্ধনে গৃহের দাসী বা গ্রামের ‘রেমোর মা’ ‘হরের মা’ জোষ্ঠ বাধিয়া কোনো স্থানে বসিয়া মাছ কুটিতেছে—কোথাও তরকারি বানাইতেছে ও গ্রামের বা বাটীর বৌ কি দিগের গুণ, ব্যবহার বর্ণনা করিয়া প্রোতুবন্ধের মন মুগ্ধ করিতেছে। চারিদিককে গোলমাল। চারিদিকে মহাগোল—‘দাও’ ‘খাও।’ বৃষোৎসর্গ দানসাগর প্রভৃতি বিরাট ব্যাপার সমাধা হইলে ছ’দিকে বৃহৎ অন্ধনে ভোজের আয়োজন হইতে লাগিল। এক অন্ধনে ব্রাহ্মণদিগের অপর অন্ধনে কারয়ুগণের ভোজন অহুষ্ঠানের পাতা লবণ লইয়া পরিবেশক দল উপস্থিত হইল।

এই সময় নিমন্ত্রিত সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা বিষম গোলমাল আরম্ভ হইল। গোপাল তখন গভীর ভাবে নীরবে এক পাশে বসিয়াছিল। জনা চাটুয্যে চীৎকার করিয়া কহিতে

লাগিল, ‘আপনারা সবাই গোপাল বোসের বাড়ীর কেলেঙ্কারীর কথা শুনেছেন! সে সকল কুছা-কেলেঙ্কারী এদেশে কে না জানে?’

এই কথা শুনিবামাত্র সমবেত লোকদিগের মধ্যে চারিদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব উঠিল। শিরোমণি মহাশয় হরিষবাবুকে লইয়া জনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরিষবাবু কাতর কণ্ঠে অহুন্নয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘জনাব, বাবা, এবারে ক্ষান্ত হও। আমার দয়া করে ক্ষমা কর। দেখ বাছা, আমি দেশে থাকি না। বহুদিন পরে মা ঠাকরুণের কাজটা করতে দেশে এসেছি। মনে করে দেখ, তিনি তোমাদের কত ভালবাসতেন—কত যত্ন করতেন। তাঁর নাম স্মরণ করে, আমার পানে চেয়ে আজকের দিনটা স্থির হও।’

‘চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।’ জনাব্দীন আহত ভল্লকের মত গর্জন করিতে করিতে কহিল, ‘ওসব কথা কে শুনবে? ওসবল কথা আপনি রেখে দিন। কেন? আপনাকে তো পূর্বেই বলা হয়েছিল—আগেই আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। আপনি কৈ আমাদের কথা শুনলেন, কৈ দশজনের মান রাখলেন? জেনেছিলেন-ই তো, গোপাল বোসকে নিমন্ত্রণ ক’লে একটা ভয়ানক গোলযোগ বাধবে।’

গোপাল একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে শুনিতেন, তাহার পার্শ্বে করুজন নব্য যুবক বসিয়াছিল। তাহারা জুড় হইয়া গর্জন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ

কহিল, ‘না, আর সইতে পারা যায় না, এ বড় অসহ্য ব্যাপার। ছোট মুখে এত বড় কথা সইতে পারা যায় না।’

গোপাল তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্ত কহিল, ‘দেখ, একটা নোট কথার বলে—‘পাগোলে কি না বলে, মাতালে কিনা যায়।’ ও কি আর একটা মাহুষ বলে গ্রাহ—ওর কথা কে শোনে—কে গ্রাহ করে? আজ হরিষবাবুর বাড়ীতে মহা সমারোহে কাজ। এ কাজে কোনরূপ বাধা হলে তাঁর কষ্টের সীমা থাকবে না।’

গোপালের কথার যুবকদল শান্ত হইল। শিরোমণি মহাশয়, দলাদলির কথা শুনিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, ‘জনা, দেখ, তোকে বলি—বেলী কথা ভুট বলিস না। খেতে এসেছিল, চুপে চুপে খেয়ে চলে বা।’

জনা চীৎকারে গগন ফাটাইয়া কহিল, ‘কেন, আমরা কি ভিথিরি বামুন যে, দেশে-দেশে বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা মেগে খেয়ে বেড়াই!’ কৃষ্ণকায় লোমশ-দেহ জনার্দন দীপ্ত বাহির করিয়া চীৎকার করিতে তাঁহার মূর্তি প্রকৃতই ক্রুদ্ধ ভঙ্গুর মত হইয়া উঠিল। বালকগণ করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিল, ‘ওরে, জনা-ভালুক কেপেছে রে—জনা-ভালুক কেপেছে।’ লোকপুত্রের বালক বৃদ্ধ বহু লোক জনার্দনকে পশ্চাতে ‘ভালুক-চাটুঘ্যে’ বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল।

শিরোমণি মহাশয়ের কথার ও বালকদিগের উপহাসে জনার্দন ক্ষিপ্ত-কুরুরের স্তায় হইয়া উঠিল। সে শিরোমণি মহাশয়ের মুণের নিকট হাত নাড়িয়া কহিল, ‘ভূমি টিকি নেড়ে বেলী

বড়াই ক'রো না। ভিধিরি বামুনের আবার এত বাড়াবাড়ি কিসে?' যখন শিরোমণি মহাশয় অপমানিত হইলেন, তখন অনেক লোক ক্রোধে গর্জিতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় সমাজের মাথা—আদর্শ মহাপুরুষ। ওণে জানে তিনি লোকপূর অঞ্চলের ছোট বড় সকল লোকের প্রাণের দেবতা। তাঁহার অপমানে সমবেত লোকসকল জুড় হইয়া জনা চাটুঘ্যেকে নানা ভাষে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাকে প্রহার করিতে উত্তত হইল, গোলযোগ ক্রমে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। জনাৰ্দ্ধনের পক্ষে মতি বস্তু প্রতৃতি আরও অনেক ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া বিষম বিবাদ বাড়াইবার উপক্রম করিতে জনতা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। উত্তর পক্ষ হইতে গগনভেদী 'মার' 'মার' শব্দ উখিত হইয়া হরিষবাবুর বৃহৎ ভবন ছাইয়া কেলিল। মহিলাগণ যিনি যে অবস্থার ছিলেন তিনি সেই অবস্থার উপর ছাদে দাঁড়াইয়া ভীত চক্ষে ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। বাঁকুড়া, মানভূমের বামুন ঠাকুরেরা ঝাঁঝেরা, ছাতা হাতে লইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা উচ্চকণ্ঠে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'আমি বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান' কেহ কহিল, 'আমি সাধুর সন্তান' কেহ কহিল, 'আমি ভগীরথের বংশের তিলক'—আমরা উপস্থিত থাক্তে আবার ব্রাহ্মণ ভোজনের ভাবনা?'

ঠাকুরদের মধ্যে দোলগোবিন্দ মুখ্যে সর্বত্র খুব কুলের গোরব করিয়া বেড়ায়। তাহার পিতা কোথা হইতে আসিয়া মানভূম জেলার দশ পনের খানি গ্রামে আপনার কুলের বড়াই করিয়া

দশ পনেরটি বিবাহ করিয়া কোথায় প্রস্থান করে! সে কোথায় জন্মে, কোথায় মরে তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। দোলগোবিন্দের মাতা, স্বামীর প্রস্থানের বহুবৎসর পরে দোলগোবিন্দকে প্রসব করে ও মাথায় মসলার ডালা লইয়া গাঁয়ে-গাঁয়ে বেচা-কেনা করিয়া দোলগোবিন্দকে মানুষ করে। দোলগোবিন্দ চারি পাঁচ বৎসরের হইলে, জননী শিবাকুমিজকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া এক হোটেলে পাচিকার কার্যে নিযুক্ত হয়। শিবাকুমিল মরিলে, দোলগোবিন্দের মাতা হাতে কিছু টাকা করিয়া গাঁয়ে ফিরিয়া আসে ও একটা ভোজ দিয়া সমাজে উজ্জল রূপে ধর্ম বজার করে। দোলগোবিন্দ মানুষ হইয়া হাতা, বেড়ী, ঝাঁঝরা সঞ্চল করিয়া 'ঠাকুর' বৃত্তি অবলম্বন করে। গলায় ময়লা কাল পৈতা ছাড়া তাহার ব্রাহ্মণত্বের অপর কোন পরিচয় পাইবার বো নাই।—সে সদরে ছুটিয়া আসিল। তখন মুণ্ডিত-মস্তক হরিষবাবু অঙ্গনে বাইয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পদতলে পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন। দোলগোবিন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'বাবু, ভয় কি আপনার, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান। 'একা আমাকে খাওয়াগে আপনার দশহাজার বামুন-ভোজনের ফল হবে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমার তাঁবে আরও অনেক ভাল ভাল কুলীন বামুনের ছেলে আছে, উঠুন আপনি, আপনার জাতকে আর খোসামোদ করতে হবে না।' জনা চাটুয্যের দল

তখন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির স্তায় জলিতে লাগিল। জনা উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চৈশ্বরে কহিল, ‘আপনারা এখন’ ভেবে চিন্তে দেখুন, মানুষের খাতির করবেন কি জাত ধর্ম বজায় রাখবেন। মানুষ গেলে মানুষ মিলবে কিন্তু জাত ধর্ম একবার গেলে আর তা ফিরে পাওয়া যায় না। বিশেষ এমন কাজ—এত বড় দুর্জয় কাজ ক’রে লোকে যদি অনারাসে হাসতে হাসতে পার হ’য়ে যায়, তবে সমাজের তো আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। তা হলে যার যা মনে লাগবে, সেই তা করতে থাকবে।’

জন্য কথায় নিমন্ত্রিত লোকদিগের মধ্যে একটা খুব গোলমাল বাধিয়া উঠিল। কতকগুলি অজ্ঞ মুখ লোক বলিয়া উঠিল, ‘তাই তো বটে, সমাজ কি এমনই মরা?’ যাহারা নামে গন্ধে কুলীনের বংশধর ছিল, তাহারা কহিল, ‘সমাজের কুলীনের ছেলেরা কি মরেছে? রাজা বজালসেনের নাম কি এমনি ক’রে এর মধ্যে ডুবে যাবে? বটেই তো! যার যা মনে লাগবে সে কখন তা করতে পারবে না। গোপাল বোস সমাজের বুকে বসে এত বড় কাজ করে যে হাসতে হাসতে পার হয়ে যাবে, তা কখন হবে না। না—কখন না!’

জনা এই সময় চীৎকার করিয়া কহিল, ‘এক কি গোপাল? গোপালের মেয়ে বৌ-তে না করছে কি?’

গোপাল এতক্ষণ নীরবে এক পাশে বসিয়াছিল। তাহার বৈধা সঙ্ক-সীমা ছাড়াইয়া উঠিল, সে উন্মত্তের স্তায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বহু যুবক তাহার সঙ্গে উঠিয়া জন্যর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের

মধ্যে কেহ কেহ জনাকে ধরিয়া গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া জনা সদলে চলিয়া গেল।

শিরোমণি মহাশয় উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, ‘পাতা করিয়া দাও, ভোজন ক্রিয়া আরম্ভ হোক, যার খুসি হয় খাবে।’ পরিবেশক-দল কলাপাতা ও লবণ লইয়া বাহির হইল। হরিষবাবুর ভোজনের বিরাট আয়োজন। কতকগুলি প্রকৃত ভদ্রলোক জনার দলের অন্তায় বুঝিয়া, গোপাল বসুর সততা জানিয়া কহিল, ‘আমরা গোপাল বোসকে চিনি, পাতা পাতিয়া দিন, আনরা বসি।’ এই বলিয়া অনেক লোক বসিয়া গেল। বৃহৎ অঙ্গনের দুই অংশে দুই ভাগে ব্রাহ্মণ ও কারস্থদিগের ভোজনের স্থান নির্ধারিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ কারস্থ দুই ভাগে দুই দল বসিয়া গেল। বাহারা গোল বাধাইবার জন্য উৎসুক উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহারাও হরিষবাবুর আয়োজন দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিল না। মোড়া মিঠাই সন্দেশ রসগোল্লার পাহাড় স্তূপ দেখিয়া অনেকের রসনা লক্ লক্ করিতেছিল। তাহারা পাতার উদ্যোগ দেখিয়া বসিয়া পড়িল। কেবল কানীনাথের কথা শুনিয়া কতকগুলি লোক জনার দলে যোগ দিবার জন্য প্রস্থান করিল—ফলে সমাজে দুইটা দল হইয়া দাঁড়াইল।

হরিষবাবু বালকের স্তায় উচ্চকণ্ঠে কাদিয়া কহিলেন, ‘আমার মা-ঠাকরুণ পুণ্যবতী ছিলেন, তাঁর কাজে এমন হলো কেন? আমি মহাপাপী। আমারই পাপের ফলে—আমারই দূরদৃষ্টে এই রকম ঘটলো।’ এই বলিয়া তিনি সজোরে বুক

চাপড়াইতে লাগিলেন। শিরোমণি তাঁহাকে সাধনা করিয়া কহিলেন, ‘বৃহৎ কর্ণে গোল হ’য়েই থাকে। জান তো বাপু, বড় কাজ করিতে গেলেই হিমালয়ের মত পাষণ—অচল অটল হ’তে হয়। জানই তো, যুধিষ্ঠিরের রাজসূর-স্বজ্ঞে ছুটে শিশুপাল কি গোলযোগ বাধিয়েছিল। সে তো কাল ছিল ছাপর—আর এটা হচ্ছে ঘোর কলি।’

হরিষবাবু শিরোমণির পারে ধরিয়া কাদিতে কাদিতে কহিলেন, ‘ওঃ, আমার যে মাথা ঘুরছে! চারিদিক অন্ধকার দেখছি! আমার একি হলো!’ শিরোমণির উৎসাহ বাক্যে হরিষবাবু প্রশান্ত ও প্রবুদ্ধ হইয়া চারিদিকে করবোড়ে ঘুরিতে লাগিলেন। মহাসমারোহের কার্য্য মহাসমারোহে স্তম্ভিত হইল। চারিদিকে সন্দেশ, রসগোল্লার ছড়াছড়ি—মোণ্ডা মিঠাইএর শিলাবৃষ্টি। হরিষবাবুর বৃহৎ ভবন ‘দ্বিতীয় ভোজ্যভাং রবে মুখরিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নয়ন বৌ নীরব—নিস্তব্ধ—নিম্পন্দ। ঘরের দাওয়ার দাঁড়াইয়া উর্জদৃষ্টে বিশাল শূন্য আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য প্রাণে নয়ন কত কি ভাবিতেছে। নয়নকে দেখিলে মনে হয়, যথার্থ শুভ্র

প্রস্তুতও বুঝিয়া কোন অপার্থিব-শিল্পী এ অপার্থিব-সুন্দর সৌন্দর্য-মূর্ত্তি বাহির করিয়াছে, যেন এ অপূৰ্ণ মূর্ত্তি কোন অজ্ঞাত-রাজ্য ওপ্ত ভাবে লুকায়িত ছিল, স্বয়ং বিধাতাও তাহার সন্ধান জানিতেন না। গোপাল দূর হইতে নয়নের সে অলৌকিক মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। তাহার চরণযুগল মূর্ত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিল। সত্যই গোপালের নড়িবার বা চলিবার শক্তি যেন নিমিষে তিরোহিত হইল। সে যেখানে ছিল সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া একমনে কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবনার ভীষণ স্রোত-প্রবাহে গোপাল আপনাকে ভাসাইয়া দিল, ভাবিতে ভাবিতে গোপাল এক অপূৰ্ণ দৃশ্য দেখিল। সে আবার দেখিল, যেন শরতের সাক্ষ্য-গগনে শ্রেষমণ্ডল-মধ্যবর্তী অপূৰ্ণ জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তাহার গৃহে বিরাজিতা! নয়নের এই আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া গোপালের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। গোপাল সাহসে ভর করিয়া, নয়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গোপালকে দেখিয়া নয়ন সরলা বালিকার জায় কঁদিয়া উঠিল।

নয়নের আজ এ কি ভাব—এ কি মূর্ত্তি! নয়নের সে হান্তময়ী চির বসন্তময়ী মধুর ভাব আজ কোথায়? কোথায় সে অপূৰ্ণ ভাব আজ হঠাৎ লুকাইল? কুসুমাদপি-নয়ন সত্যই আজ বজ্রাদপি কঠোর! নয়নের সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি আজ কঠোর বজ্রময়ী। নয়নের নয়ন আজি অশ্রুভরা! অশ্রুপূর্ণাক্ষী নয়ন, কাঠার দৃষ্টিতে পতি-মুখপানে চাহিয়া রহিল। গোপাল বিগলিত হৃদয়ে, করুণ কণ্ঠে, নয়নের হাত ছ'খানি ধরিয়া

কহিল, 'নয়ন আমার কমা কর—আমার দয়া কর। আমি অধম—আমি পতিত—আমি চণ্ডাল। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী-স্বরূপিনী—তুমি কমলা—এ অধমের গৃহ তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। জানি না, কোন জন্মের পুণ্যে—কোন সৌভাগ্যে তোমার মত নহারদ্র আমার গৃহ উজ্জ্বল করেছে—কোন তপস্যার ফলে তোমার মত দেবী আমার পাপ-সংসারে উদয় হয়েছে। সত্যই তুমি রূপে লক্ষ্মী, গুণে স্বরস্বতী। এ গৃহের, এমন সংসারের বোগ্যা তো তুমি নও! এ মাটির পৃথিবীর উপযুক্তাও তুমি নও। বিধাতা বড় দয়া ক'রে তোমার মত অমূল্য রত্ন আমাকে দিয়েছিলেন, আমি পাপী, তোমায় রাখতে পারব কেন?' বলিতে বলিতে, নয়নজলে গোপালের হৃদয় ভাসিয়া গেল।

গোপাল কঁাদিতে কঁাদিতে পুনরায় কহিল, 'নয়ন আমি তোমায় চিনি—তোমায় ভালরূপেই জানি, জানি তুমি এ'ন্দো-ডোবার সোনার কমল। আমার এই অন্ধ-কূপে তোমার মত সোনার শতদল-ফুলে সংসার আলো করবে, স্বর্গের সৌরভ বিলাবে, এ তো কল্পনার অতীত। তুমি দেবলোকের সুখা-স্বরূপিনী! অম্বরের এ অমৃত কখন সুখভোগ্য হতে পারে না! আজ আমার ঘরে প'ড়ে কমলের বন্ধে বজ্রাঘাত সহিতে হলো। এ দৃশ্য যে আর দেখতে পারি না' বলিয়া গোপাল বসিয়া পড়িল। এ কি! গোপাল যে সংজ্ঞাহীন—মূর্ছিত!

নয়ন পাগলিনীর দ্বায় ভীত দ্র্যস্তভাবে উঠিয়া গোপালকে স্পর্শ করিতে লাগিল। দেবী-করস্পর্শে মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত

হইল। গোপাল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল কিন্তু তাহার নরনেপলক নাই—মুখে কথাটিও নাই। গোপাল নীরব—নিমন্ত্রণ প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে বসিয়া রহিল। নয়ন বৌ কহিল, ‘দেখ, আমাদের দেশে একটা প্রসিদ্ধ কথা চলিত আছে—‘বিপদীর্ধৈর্য্যম্।’ মাহুয যে কেমন মাহুয—সে যে কতটা পশু হুড়ে মাহুয লাভ করেছে—কতটা উঁচুতে উঠে বড় হয়েছে, তা বুঝে নেবার মাপকাটি—বিপদে সাহস, বিপদে ধৈর্য্য। শত্রুকে বিনষ্ট করতে হলেও আগে ভাবতে হয়—আগে তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ঠিক করতে হয়—তাতে প্রবল ধৈর্য্য চাই। ধৈর্য্য নইলে মাথার ঠিক থাকে না। মাথা ঠিক রাখতে নুপারলে কোন ছোট কাজের ব্যবস্থা করা যায় না, বড় কাজের সাধনা তো বহুদূরের কথা। গোপাল রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, ‘আর কাজ করতে জীবনে সাধ নাই। যে জগতে বিচার নাই, যে সংসারে সংকার্য্যের পুরস্কার অধোগতি—বিড়ম্বনা অসংকার্য্যের পরিমাণ—সম্পদ-সুখ-সন্তোষ, সে জগতে—সে সংসারে আর কাজ করবার ইচ্ছা নাই।’ মনে হচ্ছে, সে সংসারে এই ভারী জীবনটাকে ব’য়ে বেড়ানও মহা বিড়ম্বনা।’

নয়নের দ্বান মুখে এতক্ষণে হাসির শুভ্র সমুজ্জল রেখা সমুদ্ভাসিত হইল। নয়ন স্বভাবসম্মত মৃদুহাস্তে কহিল, ‘তুমি যে বহু সময় বহুবার বলেছ, ভগবানের সেই অমৃতবাণী—

‘কর্ম্মণ্যে রাধিকারান্তে মা কলেশু কদাচন।’

বাস্তবিক জীবনের এতদিন কেটে গেল, এখন যদি ভগবানের

সোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

সেই মহৎ বাণীর অর্থ প্রাণের মধ্যে না বুঝতে পারি, যদি সংসারের কর্মক্ষেত্রে এতটা ভুক্তভোগী হ'য়েও না অল্পভব করতে পারি যে কর্মেই মানুষের অধিকার, অল্প অধিকার তার একটুও নাই, তবে এতদিন এ জীবনটা বয়ে বেড়ানই যে ব্যথা হলো।'

গোপাল, গভীর হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে কহিল, 'আর ফাকা মুখের ফাকা কথায় চিঁড়ে ভিজে না। আর আমি কিছুই বিশ্বাস করি না—কিছুই আর মানতে চাই না। ভগবান—ভগবানের রাজ্যে ধর্মাদর্ম কর্মাকর্ম বলে কিছু যে ভেদাত্মক আছে—পাপ পুণ্য বা পাপ পুণ্যের ফলাফল কিছু যে আছে, তা আর প্রাণ যেন কিছুতেই মানতে চায় না।'

নরন গোপালের মুখে আজ কথাটা শুনিয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইল। সে জানিত, গোপাল ভগবানে একান্ত বিশ্বাসী—ভগবানের প্রতি একান্ত অমুরাগী। এমন বিরল-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু স্বামীর প্রাণে হঠাৎ কেন এ বিঘন পরিবর্তন ঘটিল! স্বর্গের পবিত্র শীতল বাতাসে কেন নরকের এমন বিকট পুত্তিগন্ধময় বায়ু বহিল? এ কি হইল! নরন আকুল হৃদয়ে সন্নেহে নীরব-ভাবে ভগবানকে ডাকিল, প্রাণের ভাষে কহিল, 'ভগবান, দয়া কর প্রভো, এ ঘোর সঙ্কট হ'তে রক্ষা কর।' ব্যাকুল কর্ণে স্বামীকে কহিল, 'কেন, তুমি যে সকল সময় বলতে, ভগবানের পথ রহস্যময়। সাধু কেশ্বিনের এ কথাটা তোমার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আজ কোথা গেল স্বর্গের সে মহামন্ত্র?'

গোপাল বিরক্তভাবে উত্তেজিত কর্ণে কহিল, 'চুলোয় গেল সে

মহু—চুলোর থাক্ সে মহু। মহু-কহু সব মিছে।’ বক্ বেন বিদীর্ণ করিরা গোপালের মুখে বাহির হইল, ‘ভগবানের অস্তিত্বে আজ আমার অবিশ্বাস হইয়াছে—তঁার বিধানে আজ অভক্তি জন্মেছে।’

নরন কহিল, ‘ছি ছি, অমন কথা আর মুখে এনো না।’

গোপাল উচ্চ কর্তে সপটে বজ্জ নির্ঘোষে ক্রিপ্তের স্তায় বলিয়া উঠিল, ‘আনবো—শতবার সহস্রবার আনবো। নইলে তোমার মত নিষ্ফলক চন্দ্রে কলক, এও কি প্রাণে সহ হয়?’ দুর্ভিক্ষহ বিবাক্ত-কণ্ঠে অমৃত প্রলেপের স্তায় নরন যুহুহাস্তে কহিল, ‘সহ সকল গুণের—সমুদয় শক্তির শ্রেষ্ঠ গুণ—শ্রেষ্ঠ শক্তি। সহই সাধনা—সহই তপস্যা—সহই যোগ। সমগ্র গীতা, সাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, বীর ভাবে, অচল অটল ভাবে—সহ করা। তাতেই মাহুঘের মহুঘর বিকশিত হয়। দৃঢ়-সহিষ্ণুতাই মুখ্য সাধনা, সেই বলেই মাহুঘ ধৈর্য্য বীর্য্যবান মহা মাহুঘ হ’য়ে থাকে, সেই মাহুঘের নাম, লৌহমানব’ বাক্যে পাশ্চাত্যেরা আজকাল অতি-মানব superman বলে ব্যাখ্যা করছে। এদেশে বহুকাল পূর্বে ভগবান অতিমানবের গুচুতক বুঝিয়ে গেছেন। যোগী-জনই অতিমানব। যোগী এ জগতে সুখ দুঃখের অতীত মহাপুরুষ। তিনিই পরমানন্দের অধিকারী। একমাত্র হিত প্রজ্ঞ স্থিতিধর্ম্মই মহাপুরুষ—মহাযোগী। ভগবান তাঁর স্বরূপ লক্ষণ তুলে বলছেন :—

প্রজাহাতি বদা কামান সর্কান পার্থ মনোগতান।

আত্মস্তুেবাস্তানা তুষ্ট হিত-প্রজ্ঞ তদোচ্যতে ॥

শোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

দুঃখস্বপ্নবিগ্নমনা সুখে ব্রিগত শূহ ।

বীতরাগে ভয়ক্রোধ স্থিতিবী মুনিরূঢ়্যতে ॥

গোপাল মুহুনেজে দেখিল—তাহাদের সম্মুখ হইতে জগদ্ধাত্রী মূর্তি তিরোহিত হইয়াছে, তাহার স্থলে বীণাপাণি ভারতী মূর্তি আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে স্বহস্তে বিমানামৃত বিতরণ করিতেছেন। গোপাল বিস্ময়ে—কৌতুহলে অভিভূত হইয়া সাক্ষাৎ ভারতীর সম্মুখে নীরবে—নিম্নকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কণকাল গোপাল আত্মসম্মরণ করিয়া কহিল, ‘নয়ন, সত্যই তুমি স্বর্গের দেবী, তুমি বথার্থই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরূপিনী। আমার বহু পুণ্য ফলে—আমার বহু জন্মের তপস্তা আর মহৎ সৌভাগ্য ফলে তুমি মর্ত্যলোকে এসে আমার মৃত দীন হীনের কুটীর আলোকিত করেছ। আমি বুঝেলাম, তুমি স্বয়ং বাগ্‌দেবী—তুমি সাক্ষাৎ সীতারূপিনী। তোমার মত রমণী-রত্ন যে পৃথিব্যবান, যে ভাগ্যবান লাভ করে, তার আর অভাব কি—তার আবার দুঃখ বহুগাই বা কি?’

এই বলিয়া গোপাল মুহুনেজে নয়নের অপার্থিব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মুখপানে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে গোপালের মতিভ্রম ঘটিল। উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া গোপাল কহিল, ‘নয়ন, তোমার মত দেবীর অতি শুভ্র অতি পবিত্র নামে কলঙ্ক! এও কি প্রাণে সহ্য হয়? না না, এ সহ্য হয় না—কখনই না! প্রাণ থাকতে এ সহ্য হয় না। এর প্রতিশোধ পূর্ণরূপে নিতে পারি তো এ জীবন রাখবো, নইলে’—এই বলিয়া

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গোপাল কিশোর স্ত্রীর ক্ষতপদে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল।
উৎকণ্ঠিতপ্রাণে নয়ন শব্যায় শায়িত উবার পার্শ্বে আসিয়া
বসিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উষা বয়স্কা। উষা প্রায় তের চৌদ্দ বর্ষ বয়স্ক্রম অতিক্রম
করিয়া পঞ্চদশে পর্যাপ্তের উপক্রম করিয়াছে। কমল-কলিকা
পূর্ণাঙ্গে বিকাশোন্মুখ—জ্যোৎস্নার শশধর—পূর্ণিমার পানে
প্রধাবিতা।

নয়ন কন্ঠার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিল, ‘উষা!’ উষা উত্তর
করিতে পারিল না—নীরবে রহিল। মা দেখিল, মেয়ের চক্ষের
জলে বালিস ভিজিয়া গিয়াছে। উষা তখনও শব্যায় পড়িয়া
নীরবে রোদন করিতেছিল। মা একবার দুইবার তিনবার
মেয়েকে ডাকিল, মেয়ে আর স্থির থাকিতে পারিল না,
বালিকার স্ত্রীর কাঁদিয়া মারের পা-ছু’থানি জড়াইয়া ধরিল।
ভগ্নকণ্ঠে ভগ্ন-ভাবে কহিল, ‘মা, চলো, আর আমরা এখানে
থাকব না—লোকপুরে আর মাহুঘের থাকতে নাই। পা এখন
শিয়াল কুকুরের বাসা হ’য়েছে।’

সোল এপেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

নয়ন দেখিল, বড় সঙ্কট! চারিদিকেই মহা সঙ্কট! গাঁয়ে নানা কথা নানা লোকের মুখে—ঘরে স্বামী উন্নতের জায়—কল্যা যুতপ্রায়—ঘরে বাহিরে বিপদ! এখন এ অবস্থায় কোথা যাই, কি করি! নয়ন ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিল, এ সময় বড় ধৈর্য্য ধরিতে হইবে—বড় কঠিন হইতে হইবে। কোমলে কঠোরে মিশিয়া এক অপূর্ণ মূর্ত্তি আজ নয়ন ধারণ করিল। নয়ন দীর গভীর স্বরে কঠোর কণ্ঠে কহিল, ‘উবা, তুই তো এখন আর কচি মেয়ে ন’স। ছিঃ, অমন ছেলেমি ক’রোনা। কিসের ভাবনা? কান্না কেন? তুই তো জানিস—তুই তো বলি বাছা, পী এখন শিয়াল কুকুরের বাসা। শিয়াল কুকুরের কথায় কি এসে যার মা?’ উবা কানিতে কহিল, ‘না মা, তাদের কথা ধরি না, এখানে আমার বড় ভয় করছে। আজ বড় ভয়ের কথা শুনেছি।’

নয়ন ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি কথা?’

পাছে মা ভয় পায় বলিয়া কথাটা বলিতে উবা ইতঃপ্তত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, কথাটা এখনি বলি কি না। মায়ের কাছে এখনই বলি, কিছা বাবা আসিলে সকলের কাছে বলি। এই ভাবিয়া উবা নীরবে বলিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে গোপাল হাসিমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিল। পতির হাসিমুখ দেখিয়া নয়ন সশরীরে স্বর্গের সিঁড়িতে পদার্পণ করিল। গোপালের এমন হাসিভরা মুখখানি নয়ন কিছুদিন হইতে দেখিতে পায় নাই। বহুক্ষণ পরে ভূষিতা-চাতকিনী—নবীন মেঘ দেখিয়া আনন্দ-নীরে ভাসিতে লাগিল। গোপাল আসিয়া

কহিল, 'এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, বুকের বোকা—পাথর নেমে গেল।'

নয়ন কহিল, 'কেন হ'লো কি? হঠাৎ এমন কি স্বর্গ ধরে ফেলে যে, সকল দুঃখ—সকল ব্যথা জুড়িয়ে গেল, ব্যাপার কি?'

গোপাল কহিল, 'শিরোমণি মহাশয়ের কাছে গেছলুম।'

নয়ন...তারপর?

গোপাল...তারপর বলেন, 'কোন চিন্তা নেই। আমি তো তোমার জানি, তোমার খবরও সব রাখি, বাজে লোকের বাজে কথায় তুমি মন খারাপ ক'রোনা। জনা চাটুঘ্যেকে—তার দলবলকে এ অঞ্চলে না জানে কে—না চিনে কে? তুমি স্বর্গ—তার নরক। তারা কি তোমার ছুঁতে সাহস করতে পারে গোপাল?'

উষা কহিল, 'বাবা, ওসব কথা শুনোনা। এখানে কাউকে আর বিশ্বাস নেই।'

গোপাল দৃঢ় স্বরে কহিল, 'সে কি! কি বলিস উষা? শিরোমণি মহাশয় কি মাহুষ? তিনি বে দেবতা—দেবতা কি, আমি তো বলি, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। তাঁর কথা বিশ্বাস করব না, তাঁর কথা মানব না তো কাকে মানবো—কার কথা শুনবো মা?'

উষা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'আমি হর-পিসির কাছে শুনলুম, জনা চাটুঘ্যে এক 'ভয়ানক ডাকাতের দল তৈরি

সোল এজেন্ট—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

করেছে, সে ডাকাতের দল নিয়ে আমাদের বাড়ী ডাকাতি করবে।’

গোপাল হাসিয়া কহিল, ‘কি জন্ত ডাকাতি করবে, আমাদের কি আছে? টাকা কড়ি গহনা-পাতি থাকলে সেই লোভে ডাকাতি করে। আমাদের তো টাকা কড়ি গহনা-পাতি কিছুই নেই, কি জন্ত ডাকাতেরা আসবে?’

উবা কহিল, ‘শুধু কি কেবল টাকা নিতে আসে? তোমার যে পার-পার শত্রু বাবা? তোমার টাকা না পেলেও জীবন নিতে পারে তো।’

গোপাল উবার কথা শুনিয়া একটু হাসিল। নয়নের প্রাণ চমকাইয়া উঠিল—মুখ শুকাইয়া গেল। গোপালের মুখে হাসি দেখিয়া নয়ন মনে মনে বিরক্ত হইল। নয়ন বিরক্ত কর্তে কহিল, ‘তোমার সবই অগ্রাহ্য। তুমি কিছু গ্রাহ্য করতে চাও না। বিপদ ঘটতে বেশীক্ষণ লাগে না। ভগবান রক্ষা করছেন তাই এমন জায়গায় আজও প্রাণে বেঁচে আছি।’

গোপাল হাসিয়া কহিল, ‘কথাটা সকল সময় মুখে বল, কাজে দেখাতে পার কৈ? ‘রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে!’—কথাটা কতদিন কতবার তোমার মুখে শুনেতে পাই। কথাটা কাজে দেখাও, নইলে ফাঁকা-মুখের ফাঁকা-কথার নাম কি?’

নয়ন গোপালের কথার ঠিক উত্তর খুঁজিয়া পাইল না! বাস্তবিক সে মনে প্রাণে বুকিত ও বিশ্বাস করিত যে, ভগবান

বার করিবেন তাহাই হইবে, তাহা রদ করে এমন কলি-জগতে আর কিছুই নাই। এইটা নয়নের প্রাণের ধারণা—হৃদয়ের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস লইয়াই নয়ন নিতান্ত ভারাক্রান্ত প্রাণটাকে বহিরা গোপালের আধারময় কুটীর আলো করিয়া রহিয়াছে।

গোপাল হাসিয়া কহিল, ‘যে দিন ছুনিয়ার মালিক বুঝবেন, এ জীবনটাকে এ সংসারে রাখবার আর দরকার নাই, সেদিন তিনি নিশ্চয়ই এটাকে টেনে নেবেন। সে জন্ত তোমার আমার ভাবনা নিষ্ফল, তুমি আর ভেবোনা। তুমি আমি ভাবনা-সাগরে ডুবে মলে মেরেটার উপায় হবে কি? দেখছ কি উবার দশা কি হয়েছে! দিন দিন সে যে শুকিয়ে উঠছে!’

নয়ন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, ‘উবার বোধ হয় অসুখ হয়েছে। রোতে ওর গাটা গরম বলে আমার বোধ হয়েছিল।’ উবা কহিল, ‘না মা, আমার গাটা কিছু গরম হয়নি। বড় বিষম স্বপ্ন দেখেছিলাম, ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপতে লাগলো! আমার দেহটা যেমন জল হ’রে গেল।’ গোপাল উৎকণ্ঠিত প্রাণে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি স্বপ্ন দেখেছিলে উবা!’ উবা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, ‘সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই বাবা।’

গোপাল ছাড়িল না, জেদ করিয়া কহিল, ‘না মা, সে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। স্বপ্নের কথাটা তোমায় বলতেই হবে।’ উবা অগত্যা কহিল, ‘বড় ভয়ানক স্বপ্ন বাবা, এমন স্বপ্ন আমি জীবনে কখন দেখিনি। আমার মনে হ’ল, জনা—জলন্ত মশান থেকে আমাদের বাড়ী এলো। মশানের আগুন জলতে জলতে

জন্য মত চেহারা হ'লো, তারপর হাজার হাজার মানুষ জলন্ত-জনা হয়ে উঠলো, তারা সকলের ঘরের চালে আগুন হয়ে-হয়ে ঘুরতে লাগলো। গাঁ-ময় আগুন—দেশময় আগুন—চারি দিকে আগুন হ হ জলতে লাগলো। চারিদিকে বেড়া-আগুন, কোথাও পালাবার পথ নেই। তারপর আকাশ থেকে আগুন নেবে এসে মাকে তুলে নিয়ে গেল। বাবা, তুমি আর কেবল সেই আগুনের মধ্যে পড়ে রইলুম। তারপর গাঁ আগুনে জলতে লাগলো।' বলিতে বলিতে উষা কাঁপিতে লাগিল, তাহার মখে আর কথা বাহির হইল না। গোপাল, প্রবোধ দিবার জন্য মেয়ের মাথার হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, 'আর ওসব কথা মনে করোনা। স্বপ্নের কথা সব মিথ্যে। মিথ্যে ভাবনা ভেবো না, এস আমরা ওঘরে গিয়ে গান করি।'

গোপাল উষার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে যাইয়া উষার হাতে হারমনিয়ম দিল, পরে পিতা পুত্রীতে গান গাহিতে লাগিল। উষা গানের সঙ্গে হারমনিয়ম বাজাইতে আরম্ভ করিল। গোপাল পদ্মী ও কস্তাকে যেমন লেখাপড়া শিখাইত তেমনি তাহা দিগকে লইয়া সঙ্গীতেরও অভ্যুদয় করিত। কেবল নিজের ঘরে নয়, বাহিরে বাগ্মীদিগের পাড়ায়ও সে লেখাপড়ার সঙ্গে গাহনা-বাজনার শিক্ষা দান করিত। এই কারণে তাহার শিক্ষা নিয়ন্ত্রণীর মধ্যে বড় আন্দোলনের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লোকপুত্র পায়ে খুব গুজব উঠিল, গোপালের ঘরে সত্তর ডাকাত পড়িবে। জনা বেরুপ সাহসে বলে বলিয়ান—কূট বুদ্ধিতে তেমনি হীন, দুর্বল। তাহার বুদ্ধির বিড়ম্বনায়, পরামর্শের দ্বায়ে কথাটা বাহির ও জাহির হইয়া পড়িল। দেশের সকলেই জনাকে ও তাহার দলবলকে জানিত। বিশেষতঃ হরিষবাবুর মাতৃ-শ্রদ্ধ উপলক্ষে জনার্দন কর্তৃক যে একটা বিরাট গুপ্তগোল ঘটিয়াছিল, তাহাতে লোক-পুত্র সমাজের অনেকেই জনাকে চিনিয়াছিল। জনাই যে একজন যে সে লোক নহে, এটো বিশ্বাস হৃদয়ে ধরিয়া সেদিন বহু লোক ঘরে ফিরিয়াছিল। লোকপুত্রঅঙ্কলে বহু স্ত্রী পুরুষ সেদিন হরিষবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের অনেকেই মনে করিয়াছিল, জনা চাটুয্যে মনে করলে অন্যায়ের রাজার রাজত্ব খুচাইয়া দিতে বা কাড়িয়া লইতে পারে। যাদব শিরোমণি মহাশয়ের মধ্যস্থতায় ও গোপালের আপনার সৎগুণে ও সদাশয়তায় বিশেষতঃ হরিষবাবুর মুখ চাহিয়া সেদিনে ভোজ্যের ব্যাপারে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে নাই এবং দলাদলির প্রসঙ্গে জনার-ই পরাজয় ঘটিয়াছিল, তথাপি উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকই মনে মনে বুঝিয়াছিল, জনা একজন অসাধারণ সাহসী ও বলবান পুরুষ।

গ্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিল, জনা-চাটুয্যে সত্যিই বলির ভীম। অনেকেই কহিতে লাগিল, জনাৰ্দ্দনের দুই আঙ্গুল পরিমাণ লাঙ্গুল কেহ কেহ নাকি চক্ষে দেখিয়াছে। জনা বধার্থেই হুতুমানেব অবতার বিশেষ। কেহ বলিতে লাগিল, জনাকে লাঠির ভর করিয়া লাফাইয়া ছুঁতলার উপরিস্থ ছাদে উঠিতে অনেকে দেখিয়াছে। কেহ কহিল, জনা পিশাচ-সিদ্ধ। সে অমাবস্তায় শনি মঙ্গলবারের রাত্রিকালে শ্রশানে বাইয়া মড়া জাগাইয়া তাহার সহিত কথা কয়। এইরূপ জনা সম্বন্ধে নানাভাবে নানা কথা কহিতে লাগিল। কলে জনা দেশমধ্যে অচিরেই একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ও প্রচারিত হইয়া উঠিল। দেশের বহু বদমাসের—বাহাদুর চুরি জুয়াচুরি ভিন্ন উদরায় সংস্থানের আর উপায়ান্তর নাই, তাহারা অনেকেই জনাৰ্দ্দনের বিজয় নিশানের তলে আসিয়া আশ্রয় লইল। জনাৰ্দ্দনের দল বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিল। জনাৰ্দ্দন মনে করিল, এখন সে শিখ-পাহারা-পরিবেষ্টিত ধনবান হরিষবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত অনায়াসে লুট-দরাজ করিতে সক্ষম।

জনা কতকগুলি লোক লইয়া রজনীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। আকাশ মেঘাবৃত, গাঢ় ঘন অন্ধকারে ভীষণ রাত্রিটা ঘেন বিষম ভারাক্রান্ত ও শুষ্ক হইয়া নীরবে ঠিক একই জায়গায় নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জনার দলের লোকের পদশব্দে ও নিশ্বাসে রাত্রির গভীর নিশ্চলতা ভাঙিয়া গেল। বৃক্ষশাখে পক্ষী সকল ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল

একটা পেচক ধনাবৃত পত্রের মধ্য হইতে ধূ ধূ রবে গভীর ডাক ছাড়িল। রজনী তখন গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। নিদ্রার ঘোরে তাহার কিছু সংজ্ঞা ছিল না। রাত্রির নিশ্চিন্ততা ভয়ের সহিত তাহার নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। জনা তাহার ঘারে আঘাত করিয়া ডাকিল, 'রজনী, ও রজনী?' রজনী ঘুমের ঘোরে জনার কণ্ঠস্বর ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, 'কে?'

জনা কহিল, 'টিস্বে পাচ্ছ না, আমি গোপাল বোস। রজনী তাড়াতাড়ি ছুরার খুলিল। ছুরার খুলিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া প্রদীপ ধরাইল।

জনা সদলে রজনীর গৃহমধ্যে আসিয়া তক্তাপোষে বসিল। ঘরের মধ্যে হাঁকা, কলিকা, তামাক, টীকা সকলই ছিল, জনা কহিল, 'রমা শালা মড়ার মত চূপ করে বসে রইলি কেন! তামাক সাজ না। রমা জনার পূর্বপরিচিত জনৈক বদমায়েস, রমাই জনার হুকুম তামিল করিতে প্রবৃত্ত হইল। তামাক সাজিয়া রমাই জনার হাতে হাঁকা দিল, জনা তখন গাঁজার নেশায় চক্ষু লাল করিয়াছিল। তামাক সেবন করিয়া জনাই রজনীর দিকে চাহিয়া কহিল, 'আর দেরি করলে সব কাজ পণ্ড হবে।' রজনী জ্বকুটী করিয়া কহিল, 'আমি কি দেরী করতে বলছি? গোপালের সর্বনাশ বেদিন দেখব, সেদিন থেকে চার-পাঁয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব' বলিয়া একটু খামিয়া স্বর গাঢ় করিয়া পুনরায় বলিল, 'তোদের দিয়ে কি আমার সে দিন আসবে; তোরা মেয়েমানুষের অধম। তা নইলে গোপাল বোসের দামড়া-মেয়ে, নিশ্চিন্তে

বারো-পাঁচের খেয়ে পরে বেড়াচ্ছে! বলিয়া বাম্পাকুল নয়ন অঞ্চল দিয়া ঢাকিল।

জনাই রজনীর হাতে ধরিয়া কহিল, ‘কাদিসনে ভাই, তোর জনাই থাকতে ভাবনা কিসের! এ কি গোপাল বোস! তুই একটু সহায় হ’ ত, দেখি একবার ব্যাটা কোথায় যায়? রজনী—সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, ‘আমি সহায় না হ’লে এতদিন তুই কোথায় থাকতিস জানিস!’

জনাই কহিল, ‘থাক্’ ওসব কথা পরে হবে।’

পরে উভয়ে অনেক রাত্র পর্য্যন্ত যে মনস্ত পরামর্শ করিল, তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সেদিন প্রভাতে পূজা অর্চনা সমাপন করিয়া নয়ন বৌ সবে মাত্র রাস্তাঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় প্রবোধ,—‘বৌদিদি কোথায়’ বলিয়া অন্তরের প্রাক্ষেপে আসিয়া পাড়াইল।

নয়ন বৌ ত্র্যস্ত মন্তকে অঞ্চল টানিতে টানিতে পাকশালার বাহিরে আসিয়া সহাস্ত আননে কহিল, ‘ঠাকুরপো বে! এতদিনে মনে পড়ল বৌদিদিকে?’

‘তোমাদের তুলে যাব বৌদিদি’ বলিয়া নিকটে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, ‘ভারপর, কেমন আছ বৌদিদি, খবর ভাল ত?’

নয়ন বৌ স্নানমুখে কহিল, ‘ধবর আর মন্দ বলি কি করে। ভগবান যা করেন সবই ত’ আমাদের ভালর জন্য ? কাজেই পবর ধারাপ বলতে পারি না।’ বলিয়া শুক হাসি হাসিলেন। প্রবোধ কহিল, ‘তোমার মত বৌদি’র উপযুক্ত কথা। উষা কোথায়, সে কেমন আছে?’ নয়ন বৌ বলিল, ‘সে বোধ হয় স্নান করতে গেছে, উষা ! ও উষা—তোমর কাকা এসেছে রে, এসিকে আর।’ নয়ন কহিল, ‘ঠাকুরপোর এবার ক’দিন থাকা হ’বে ? শরীরটাকে ত’ অর্ধেক করে এসেছ।’

প্রবোধ হাসিয়া কহিল, ‘তোমরা পৃথিবীর কোন আপনার লোককে কখনও মোটা দেখলে না। এবারে থাকব বোধ হয় একমাস ! আচ্ছা, বাবার আগে তোমাকে দিবে বলিয়ে নেব যে, ‘আমি মোটা হয়েছি’, বলিয়া হাসিতে লাগিল। এমন সময়ে গোপাল রাজি-জাগরণ-ক্লান্ত শুক ক্লান্ত মূর্তী লইয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া সন্মুখে প্রবোধকে দেখিয়া বিস্মিত কর্তে কহিল, ‘এই যে প্রবোধ, কখন এলে ভাই ! তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম।’ প্রবোধ কহিল, ‘তোমার এ মূর্তী কেন ? কোথাও মড়া পোড়াতে গিয়েছিলে ?’ গোপাল কহিল, ‘না গো না, ও পাড়ার বন্দুদের বড় ছেলের কাল রাজি থেকে কলেরা, সেট খানেই সারারাজি তার শুক্রবা করে তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদাবস্থায় দেখে এখন ফিরছি।’ বলিয়া মুহূর্তেক ধামিয়া বলিল, ‘প্রবোধ, তোমার সঙ্গে বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, বাবার সময় দেখা করে যেও।’ বলিয়া ঘরের দিকে চলিল।

নয়নবো প্রবোধকে কহিল, ‘আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ? এস, এখানে বস।’ বলিয়া সেখানে একখানা আসন পাতিয়া দিল। প্রবোধ বসিয়া কহিল, ‘দেশের খবর কি বৌদি ?’ নয়ন বো শুধু হাসি হাসিয়া কহিল, ‘দেশের খবর কি তা’ তোমার বৌদিদি গ্রামের এক কোনে বসে কিছুই জানতে পারে না। তবে—গ্রামের খবর বখাপূর্ব্বম্। তারপর বা কিছু, ও’র কাছে শু’নো।’

‘কিছু কিছু শুনেছি সেই শ্রাদ্ধের সময়ে জনার কীর্ত্তি ! বৌদিদি, এ আমি তোমায় বলে রাখলুম, আমি একটু সুবিধে পেলেই বেটাদের বদমাইসির ইতি করব।’

ভগবানের ইচ্ছে থাকলে সে সুবিধে মিলতে কষ্ট হবে না। থাক সে কথা, এখন মেয়েটার একটা বিয়ে না দিতে পারলে অস্তু আর কোন কথা মনে আনতে পারি না। যে সমাজ, সমাজের নিয়ম না মানলে চলবে না ঠাকুরপো। সমাজ বে চায় এই বয়সে কিবা এর আগেই মেয়েদের পাজস্ব করা। আমি যদি না করি, না পারি, সমাজ বে রাগ করবে সেটা তু’ অন্তার নয়। বে ক’রে হোক, এমাসে না হয় ওমাসে উবার বিয়ে আমি দেবোই এ তোমায় বলে রাখলুম।’ এরূপ সময়ে সদরগৃহ হইতে গোপাল ডাকিল, ‘প্রবোধ, বৌদিদির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে একবার এদিকে এস।’ নয়নবো শুধু হাসিয়া কহিল, ‘বাও বাও ঠাকুরপো, ওনার আর তর শইচে না।’ প্রবোধ উঠিয়া ধীরে ধীরে সদরের দিকে চলিল। প্রবোধ ঘরে প্রবেশ করিতেই গোপাল কহিল, ‘বসো, তোমার সঙ্গে একটা

পরামর্শ আছে। প্রবোধ গোপালের নিকট উপবিষ্ট হইয়া কহিল, 'কেন বল ত? ব্যাপার কি!'

গোপাল বলিতে লাগিল, 'তুমি বোধ হয় জান, নানা কারণে জনাই আমাদের নানা রকমে বিগদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করছে। সে যে রকম ভীষণ প্রকৃতির লোক, তাতে একটা কিছু করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়, তার লোকবলও যথেষ্ট। কাল রাতে কলু-বাড়ীতে রোগের জন্ত গিরেছিলাম, মাক-রাতে একবার ডাক্তার ডাকবার প্রয়োজন হয়। ডাক্তারবাড়ী যাবার সময় দরজা দিয়ে যখন যাই, তখন সেখানে জনাইকে দেখে আমার সন্দেহ হয়। আমি আড়ালে থেকে শুন্লাম, আমার বাড়ী ডাকাতি করবার এবং আগুন লাগাবার পরামর্শ হচ্ছে। আজ রাতেই তারা তাদের কার্যসিদ্ধি করবে ঠিক করেছে। এখন বল কি করি।'

প্রবোধ স্থির চিত্তে গভীর ভাবে কহিল, 'জনাই বেটা যে কত বড় পাজি তা আমি জানি। আচ্ছা, দেখা যাক তার বুদ্ধির কত বড় দৌড়। দেখ গোপাল, এখানকার যে দারোগা, সে আমার পরম বন্ধু। কলেজের বন্ধু হলেও এখনো সে আমার খাতির রাখে। আমি গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বলি, সে আমার সাহায্য করবেই আর তার করাও উচিত। তারপর কতদূর কি করতে পারি দেখা যাক।' বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

সেদিন অপরাক্তে নয়ন বৌ আপনার গৃহে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। উঠি-উঠি করিয়াও কিছুকিছুকিছু সমাপ্ত

না করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এক্রপ সময়ে উষা গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, ‘মা, তোমার ডাকছে।’ নয়ন বৌ পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, ‘কে মা? তাহার কথা শেব না হইতেই বিজন গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, ‘মা, আমি কাল ক’লকাতায় চলে যাব, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।’

নয়ন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘সে কি বাবা, হঠাৎ তুমি দেশ ছেড়ে ক’লকাতায় যাবে কেন?’

বিজন নতমুখে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নয়ন পুস্তকখানি মুড়িয়া উষাকে কহিল, ‘মা, বিজনকে একটা আসন এনে দাও। উষা আসনখানি আনিলে নয়ন বৌ বিজনকে কহিলেন, ‘বোসো বাবা, বোসো।’

বিজন বসিলে নয়ন বৌ কহিলেন, ‘হঠাৎ তোমার চলে যাবার কারণ বুঝতে পারছি না বাবা।’

বিজন ধীরে ধীরে কহিল, ‘মা, আমার জন্মেই আপনাদের এই লাজনা।’

উষা ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। নয়ন বৌ বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, ‘আমাদের লাজনা তোমার জন্মে? ছি ছি, ও কথা বলো না বাবা। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান লাজনা এ যে দেবার তিনিই দেন, তবে ভাল এবং মন্দ এই দু’টোর মধ্যেই তার শুভ ইচ্ছা দেখতে গেলেই ভাবনা চিন্তা কষ্টের হাত থেকে পরিত্যাগ পাওয়া যায়।

আমাদের এই অপমান লাহুনা বে মজলের জন্তে নয়, তা তোমার কে বলে? তবে তুমি এ জন্তে কেন দুঃখ পাও আর নিজেকেই বা এর কারণ বলে ভেবে কষ্ট পাচ্ছ কেন?’

বিজন রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, ‘কিন্তু লোকে বে বলে।’

নয়ন বৌ মুহু হাসিয়া কহিল, ‘বে লোকেরা বলে, তারা দুশ্চরিত্র, ইতর, এ জেনেও যারা তাদের কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না, তারা ঠিক পুরুষের মত কাজ করে না বাবা, আর তুমি নিজেকে বেশ জান, তোমাকেও আমরা ভাল করে জানি। কোন দিক দিয়েই ত’ তোমার কোন কষ্টের কারণ থাকতে পারে না। দেশ ছেড়ে মিথ্যা বিদেশ বাবার অনর্থক কল্লনা ছেড়ে দাও—তোমরাই ত’ দেশের ভরসা। দেশ থেকে দেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের সেবাই বে তোমাদের ধর্ম। কথায় কথায় দেশ ছেড়ে যাওয়া আর আত্মহত্যা এ দুই-ই সমান।’

দেশের কথা কয়টি নয়ন বৌ একটু জোর করিয়াই বলিয়াছিল, ‘কে আত্মহত্যা করলে আবার বোদি’ বলিতে বলিতে প্রবোধ উঠান হইতে বারান্দার উঠিল এবং বে ঘরে নয়ন বৌ বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে আসিয়া বিজনকে দেখিয়াই কহিল, ‘বিজন বে রে!’ বিজন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, ‘বন্দন প্রবোধ কাকা!’ প্রবোধ আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, ‘হাঁ, আত্মহত্যার কথা কি বলছিলে?’

নয়ন বৌ মুহু হাসিয়া কহিল, ‘বলছিলাম, তুমি আত্মহত্যা করেছ।’ প্রবোধ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, ‘আমি!’

সোল এজেন্ট কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

‘হ্যা গো হ্যা, তুমি। বিজনকে বলছিলাম, দেশ ছেড়ে যারা অনর্থক বিদেশে যার, তারা আত্মহত্যা করে।’ প্রবোধ উচ্চ হাসিয়া কহিল, ‘ওঃ, এই?’ পরে গম্ভীর হইয়া কহিল, ‘কিন্তু কি করি বলুন। পেটকে ত’ আপনারাই বলেন বড় বালাই। যাক, এই নিরে পরে একদিন আপনার সঙ্গে কথা হবে। এখন’ বলুন, গোপাল-দা কোথায়।’

নরন বৌ কহিল, ‘উনি বোধ হয় ঘটকের সঙ্গে ও-পাড়ায় গেছেন। আস্তে সন্ধ্যা হবে নিশ্চয়ই।’

প্রবোধ কহিল, ‘ওঃ, বটে। আজ্ঞা, সন্ধ্যার সময়ই এসে দেখা করবো এখন? তা হলে আসি বোদি’ বলিয়া প্রবোধ প্রস্থান করিল।

তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, নরন বৌ সংসারের কাজ সারিয়া, তুলসী-তলায় গন্ধাজল ও আলো দিতেছিল। এমন সময় গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবোধ প্রবেশ করিল। বাহিরের বারান্দার একখানি মাদুরের উপর গা এলাইয়া দিয়া গোপাল বিজ্রাম করিতেছিল, প্রবোধকে আসিতে দেখিয়া কহিল, ‘এস, ভাই এস।’

প্রবোধ বারান্দার উঠিয়া মাদুরের এক পাশে বসিয়া কহিল, ‘কতক্ষণ এলে?’

গোপাল কহিল, ‘এই ত, এইমাত্র এলাম। তারপর এদিকের তুমি কি করলে?’

প্রবোধ কহিল, ‘আমি এদিকের সব ঠিক করেছি। আজ

সকালে দারোগাকে গিয়ে সব খুলে বলেছি, তিনি যতদূর
করবার করবেন, সেজন্য তুমি ভেবো না। আমি খাওয়া-দাওয়া
সেরে এখানে এসে আজ শোবো! দারোগা—পুলিশ-পাহারা
নিয়ে গুল্লবেশে আসে-পাশে লুকিয়ে থাকবে। বেটারা 'আজ
- যদি এদিকে আসে ত' নিস্তার নেই জেনো।'

গোপাল কহিল, 'নিজের জন্ত কখন ভাবিনি ভাই, কারণ,
চিরদিনই জানি, ভগবান রক্ষে করলে মানুষের সাধ্য নেই
কাউকে বিপদে ফেলে, কিন্তু ভাবনা যত মেয়েদের নিয়ে।
কারণ, কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া ইতর—সমাজের দোহাই দিয়ে
মিথ্যা আচারের ভান দেখিয়ে—নিরীহ নারীদের কি লাঞ্ছনা
না করে—তার যে কোন প্রতীকার নেই।'

প্রবোধ কহিল, 'সে কথা পরে হবে, এখন আসন্ন বিপদের
জন্ত প্রস্তুত থাকো, সেই কথাই বলতে এলাম। আমি যাই,
খাওয়া দাওয়া সেরে আসছি' বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নয়ন বৌ ধীরে ধীরে গোপালের নিকটে আসিয়া কহিল,
'তোমাদের এত পরামর্শ কিসের?'

'পরামর্শ একটু ছিল, সে তোমার শুনে কাজ নেই।' বলিয়া
গোপাল চিন্তিত মনে অন্তদিকে চাহিয়া রহিল।

নয়ন বৌ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, 'ও-পাড়ান্ন যে
গেলে, তার কি হল?'

'কই, কিছুই হলো না। একবার দেখে আসা দরকার বলেই
ঘটকের সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

কয়েক মূহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সে কহিল, 'এ তোমার বলে রাখছি নয়ন, উপযুক্ত পাত্র ছাড়া, উষাকে আমি বিয়ে দিতে পারিব না।'

নয়ন বৌ মূহূর্ত্তে ধীরে ধীরে কহিল, 'দেখ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে ক'দিন থেকে ভাবছি।'

গোপাল কহিল, 'তোমার মনের কথা স্বচ্ছন্দে আমার বলতে পার। তোমার কোন কথা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা ত' বলিনি নয়ন।'

নয়ন বৌ বলিতে লাগিল, 'দেখ, আমার ইচ্ছে, বিজনের সঙ্গে উষার বিয়ে দি। বিজনকে আমি এতদিন দেখে আসছি, তার হাতে উষাকে দিই আমি নিশ্চিত হতে পারব। লেখা পড়া ও স্বভাব চরিত্রে বিজন চিরকালই ভাল। আর সে ত' তোমারই ছাত্র, ওদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল, সব দিক দিয়েই বিজনকে উপযুক্ত পাত্র বলে আমার মনে হয়। তোমার কি মত?'

গোপাল হাসিয়া কহিল, 'হুত ত' আমার ভিন্ন হ'তে পারে না। তবে ওর মা বাপের মতটা যে আগে জানা দরকার।'

নয়ন বৌ কহিল, 'তোমরা বেটোছেলে, তার ডার তোমার ওপর।'

গোপাল অশ্রমনস্বভাবে উত্তর করিল, 'আচ্ছা দেখি।'

নয়ন বৌ কি কাজে উঠিয়া অন্যরের দিকে প্রস্থান করিল।

বাহিরে তখন প্রকৃতির চারিদিকে অন্ধকার গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠিতেছিল। খিল্লির অবিরাম কর্কশ-ধ্বনি যেন অন্ধকারের বুক ভরিয়া তুলিতেছিল। জোনাকির স্নান আলোটুকু ইতঃস্তুত জলিতেছিল—আবার নিভিতেছিল। দিবসের শাস্ত কোলাহল—অন্ধকার-আবরণের অন্তরালে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া, স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল।

গোপাল এতক্ষণ বাহিরে বসিয়াছিল। বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে সে সেই সময় দেশ কাল বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া, সে জ্যেষ্ঠে উঠিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার বহুদিনের পুরাতন বিশ্বস্ত লাঠি গাছটিকে যেন সচেতন করিবার জন্য দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া নির্নিমেঘ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। অতীত কালে নিজের এবং পরের কৃত ভীষণ বিপদের সম্মুখে এই লাঠি গাছটিকেই নির্ভর করিয়া বুক ফুলাইয়া সে দাঁড়াইয়াছে। তাহার বাহু-শক্তি এই লাঠি গাছটিকেই কেন্দ্র করিয়া নিরীহের উপর দুর্জনের অত্যাচারকে পরাহত ও বিদ্রুত করিয়াছে। আজ পুনরায় বিপদের সূচনা হওয়ার পূর্বে তাহার চির বিশ্বস্ত লাঠি গাছটিকে বন্ধুর মতই বক্ষের পাশে রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের বারান্দায় ফিরিয়া আসিয়া মাদুরের উপর উপবেশন করিল।

নয়ন বোঁ কিছুকাল পরে আসিয়া জানাইল, ‘আহার প্রস্তুত।’

গোপাল কহিল, ‘তুমি আর উবা খেয়ে নাও, আমি একটু পরে খাব, প্রবোধের আসবার কথা আছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছি।’

নয়ন বৌ ফিরিতেছিল, হঠাৎ স্বামীর পার্শ্বে লাঠি গাছটিকে দেখিয়া সে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আবার লাঠি বার করেছ! তোমার পাশে শুকে দেখলে বড় ভয় করে। কি হয়েছে বল না তুনি’ বলিয়া সে বসিবার উপক্রম করিতেই গম্ভীর কণ্ঠে গোপাল কহিল, ‘তোমরা খেয়ে-দেয়ে বিজ্ঞান করগে। এখন তোমার আমি কিছু বলতে পারব না।’ স্বামীর এইরূপ উত্তরে তাহার অন্তরধানি এক অজানিত আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল।

নয়ন বৌ স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়া তারাক্রান্ত অন্তরে—অন্ধরের দিকে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরেই প্রবোধ গোপালের নিকট আসিলে, দুই জনে নানারূপ পরামর্শে রত হইল।

চন্দ্রভূষণ পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন প্রায় দুইটা, তখন হঠাৎ গোপালের বাড়ীর সম্মুখে ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হইল। ধর, পাকড়াও, মার

ইত্যাদি শব্দে পল্লীবাসী সচকিত হইয়া উঠিল। গোলমাল কিয়ৎ পরিমাণে থামিলে জানা গেল—জনাই, রমাই প্রভৃতি গোপালের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। পুলিশ-প্রহরী তাহাদিগকে সদলবলে ধরিয়া ফেলিয়াছে। গোপালের বাড়ীর সম্মুখে তখন ভীষণ জনতা শৃঙ্খলাবদ্ধ জনাইয়ের দলকে লইয়া ব্যস্ত। এইরূপ সময় করেকজন ‘আগুন’ ‘আগুন’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখা গেল, ঘোবালের বাড়ীর পশ্চাতে আগুন লাগিয়াছে। জনাইয়ের দলকে কড়া পাহারায় রাখিয়া সকলের বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে বাইতেই অনেকে দেখিল, এক মহুয়া মূর্তি বাড়ীর পশ্চাতে বনের ভিতর দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে। সমাগত লোকদিগের মধ্য হইতে প্রবোধ ছুটিয়া মহুয়া মূর্তির অহুসরণ করিল এবং অন্নকণের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া গোপালের বাড়ীর সম্মুখে আনয়ন করিলে দেখা গেল, মহুয়া মূর্তি আর কেহ নহে—স্বনামধস্তা রজনী।

এদিকে অগ্নি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া বিশেষ কতি করিবার পূর্বে সমবেত সকলে তাহা নিবাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল।

তখন সকলে মিলিয়া রজনীকে জেরায়-জেরায় অস্থির করিয়া তুলিল--‘তুমি কেন আসিয়াছিলে? বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে তোমার কি কাজ, পলাইতেছিলে কেন?’—ইত্যাদি ইত্যাদি। রজনী নিতান্ত নিরীহের মতন উত্তর করিল যে, গোলমাল শুনিয়া এবং বাড়ীর সম্মুখে জনতা দেখিয়া সে

সোল এজেন্ট—কমলিনী সাহিত্য-মন্দির

খিড়কীর ছরার দিয়া বাড়ীর শ্রীলোকদিগের নিকট হইতে গোলমালের কারণ জানিতে গিয়াছিল, প্রবোধ তাহাকে অস্তায় ভাবে ধরিয়া অপমানিত করিয়াছে।

জানাই তাহা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওর আবার অপমান! ওই ত’ আমাদের লোভ দেখিয়ে গোপাল বোসের বাড়ী ডাকাতির মতলব দিয়েছে।’ বলিয়া সে রমাই প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, ‘কেমন কিনা, তোরাই বল না রে?’ সকলে একবাক্যে বলিল, ‘ওরই মতলবে ত’ আজ এখানে এসে ধরা পড়লুম। ছাড়া পেলে এখনই ঐ মাসীর নাক, আর কান দুটো কামড়ে ছিড়ে ফেলে দি।’

উপস্থিত গ্রামবাসীরা উঠেদেখি হাসিয়া উঠিল!

দারোগাবাবু গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘আপনার বাড়ীতে ডাকাতি হবার সংবাদ পূর্বে পেয়ে আমি বদমায়েসদের ধরবার সুযোগ পেয়েছি। আমি বিলম্ব করতে পারব না। এদের নিয়ে আমি থানায় চললাম’ বলিয়া তিনি প্রহরীদিগকে আসামীদের লইয়া থানায় বাইতে আদেশ দিলেন।

পরদিন প্রভাতেই প্রবোধ গোপালকে কহিল, ‘মাহুকের মত মাহুখ থাকলে জানাই এতদিন সমাজের ভেতর থেকে মাথা নাড়তে পারত না এইটেই আমরা ভাল ক’রে বুঝিয়ে দিলাম। এখন কথা হচ্ছে, উদার বিয়ে। আমার মত যে, তুমি বত নীচ পার ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা কর—আমিও দেখছি এদিকে।’

গোপাল উত্তর দিল, ‘উষার বিয়ের সম্বন্ধে তুমি নয়ন রউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যা বোঝ, কর—ভীরু ইচ্ছে, বিজনের সঙ্গে উষার বিয়ে হয়।’

প্রবোধ মুহু হাসিয়া কহিল, ‘ওঃ, এই ? আচ্ছা দেখি, কি বলেন বউদিদি, বলিয়া অন্তরের দিকে প্রস্থান করিল।

’ রাত্রি আগরণ-ক্লান্ত নয়ন বৌ ঘরের এক কোণে বসিয়া পূর্ক রাত্রির ঘটনা সকল স্মরণপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রবোধ ঘরে প্রবেশ করিতেই ‘নয়ন বৌ গম্ভীরে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, ‘খুব দেখলুম ঠাকুরপো তোমার দেশের’.....

প্রবোধ কহিল, ‘আর আমরা যা দেখালুম, তা বুঝি মনে ধরলো না ?’

নয়ন বৌ মুহু হাসিয়া বলিল, ‘সেই কথাই ভাবছিলুম এতক্ষণ।’

প্রবোধ কহিল, ‘কিন্তু আমরা সে ভাবনা অনেকগুণ ছেড়ে দিয়েছি। বাজে জিনিস ভেবে আমরা মাথা নষ্ট করি না। আমি ভাবছি এখন উষার বিষয়ের কথা। এইবার উষার বিয়ে দিলে আমরা নিশ্চিন্ত হবো। শুনলুম, তুমি নাকি বিজনের সঙ্গে উষার বিয়ে দেবে ঠিক করেছো ?’

নয়ন বৌ কহিল, ‘ঠিক কিছু করিনি, তবে মনে করেছি। বতরুণ না তার বাপ মায়ের মত হয় ততক্ষণ এর কিছুই ঠিক হতে পারে না।’

প্রবোধ কহিল, 'আচ্ছা, তবে তাঁদের মত করবার ভার আমিই নিলাম।'

নয়ন বো, 'তা হলে ত' ভালই হয়। তোমরা একটু উঠে পড়ে লাগ না ঠাকুরপো।'

'সে তোমায় বলতে হবে না বৌদি। আচ্ছা, আমি তবে এখন আসি, তোমরা যোজ যেমন কাজকর্ম কর, আজকেও তেমনি ভাবে করে যাও। মনে ক'রো, যেন কিছুই ঘটেনি।' বলিয়া প্রবোধ চলিয়া গেল।

সেইদিন বৈকালেই প্রবোধ হাসিমুখে নয়ন বো'র নিকট আসিয়া কহিল, 'তাদের কখনও অমত হতে পারে?'

নয়ন বো হাসিতে হাসিতে কহিল, 'কাদের গো?'

প্রবোধ কহিল, 'কাদের আবার? বিজনের বাপ মা দুজনেরই। তাঁদের মত করিয়ে তবে আমি এইখানে তোমাদের খবর দিতে এলাম।'

উল্লিখিত ঘটনার প্রায় দুইমাস পরে উবার সহিত বিজনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিচারে তাহাদের ডাকাতি প্রমাণ হওয়ার—জনাই প্রভৃতি সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশে আনিষ্ট হইয়া জেলে প্রেরিত হইয়াছিল। রজনীও দণ্ডদেশ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

যতদিন জনাই প্রভৃতি নিঃসঙ্গ চিত্তে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত, নিরীহ সকলে ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। যাহারা কাহারও কিছু অনিষ্ট বা সর্বনাশের

চেটার থাকিত, জনাই ছিল তাহাদের ভরসা। জনাইয়ের কারাদণ্ডদেশে গ্রামে অনেক পরিমাণে শান্তি স্থাপিত হইল। কারণ, নিরীহ সকলে স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রামের ভিতরে আপনার এবং পরের কাজ নির্বিশেষে করিবার অবসর পাইল। বাহারা ছুট প্রকৃতি, তাহারা জনাইয়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, বাহারা কিছু ভাল তাহাদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার সৌভাগ্য হারাইল।

গোপাল এবং গোপালের ছাত্রের দল প্রবোধের সহায়তায় গ্রামের ভিতরে সদমুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় তাহাদিগের সকল প্রচেষ্টা নিযুক্ত করিল। এমনই করিয়া দিনের পর দিন গ্রামের উন্নতি, পরোপকার, লোকহিতকর অমুষ্ঠান করিয়া তাহারা অচিরেই গ্রামের সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইল। গোপালের কস্তার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপিত হওয়ার বিজ্ঞানের পিতা মাতা প্রথমে সর্বাস্তকরণে অসুমতি না দিলেও শেষে গ্রামের ভিতরে গোপালের ক্রিয়া কলাপাদি দেখিয়া এবং তাহার গুণসকল স্বচক্ষে দেখিয়া এবং বুঝিয়া তাহার কস্তাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিতে কোন প্রকারে অমত করিতে পারিলেন না।

বিবাহক্রিয়া-সম্পন্ন হইয়া গেলে নয়ন বৌ—গোপাল এবং প্রবোধকে সম্মল চক্ষে কহিল, ‘মনের মতন পাত্রের হাতে উবাকে দিতে পেরেছি বলে কেবলই আমার মনে হয়, ভগবানের কৃপা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হব না।’

প্রবোধ কহিল, 'ঐ বিশ্বাসটুকু আঁছে বলেই কোন
বিপদকে কখন গ্রাহ্য করিনি।'

গোপাল কহিল, 'মাতের আমার বিয়ে দিয়ে সংসারের
কাছে হিসেব নিকেশ চুকিয়েছি। এক নয়ন বোঁ—তার জন্ত
আমি কোন দিন ভাবি না। এখন বাইরে ঝাঁপিয়ে
পড়েছি। সেখানে কোন বাধা বিয় আর আমার শক্তিকে
পরাস্ত করতে পারবে না।'

উজ্জ্বল পরিচ্ছেদ

* * * * *

তাহাদিগের মধ্যে বখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তখন পল্লীর আর একদিকে একটি বাড়ীর একখানি গৃহে বিজন উষাকে কহিতেছিল, ‘আমার জন্তেই ত’ তোমাদের এত কষ্টভোগ করতে হ’লো।’

উষা স্বামীর মুখে হাত রাখিয়া তাহার কথার বাধা দিয়া কছিল, ‘আবার ওকথা বলছো? তুমি আমাদের বিপদের কারণ, না সম্পদের কারণ? তুমি আমাকে পায়ে স্থান দেবার পর থেকেই, দেখনি কি যে, এ গ্রাম দিনের পর দিন কেমন উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর ত’ কোথাও কোন গোলমাল নেই! চারিদিকে কেমন সুখ, শান্তি। এর কারণ কি জান?—তুমি!’

ইহা শুনিতে শুনিতে বিজন তাহাকে দুই হস্তে আলিঙ্গন করিয়া বুকের নিকট টানিয়া আনিবার পূর্বেই—গলায় ঝাঁচল দিয়া উষা স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

অব্যক্ত

ভগ্নসাম্রাজ্য উপন্যাস-সাহিত্যাকাশে
বিদ্যুৎ বিকাশ !

?

— নবাব আলীবর্দীর স্নেহ-পুত্তলি —

বাংলা-মসনদের সৌখীন-আলাল—
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার—নবাব-দুলাল
নবাব-তক্তের বনিয়াদি নবাব

— সেই —

নবাব সিরাজউদ্দৌলা !!!

‘কমলিনীর’—‘রাজপুত্রের মেয়ে’ প্রণেতা

ত্রিযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধের রচনা
চিত্রবহুল নবাবী-উপাখ্যান

— নবাব —

সিরাজউদ্দৌলা

বিশ্ব-বিক্রম-চিহ্ন-শিরীষের

বিশ্ববিমোহন চিত্রাবলী ভূষিত হইয়া

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রেম-রঙ্গ-ভরসারিত উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গে—
ধর্মসঙ্গত—পরিপূর্ণাঙ্গ-সংসাহিত্য আজ
উপন্যাসের গৃষ্ঠায় গৃষ্ঠায় সু-প্রচারিত !

পরিব্রাজক—শ্রীভিক্ষু অকিঞ্চনের
প্রাণপাত পরিশ্রমে প্রস্তুত সংসাহিত্য-রসকরা—
বাখাদিনী বীণাপানির এসাদি সাহিত্য-পায়সায়
—আজ—

সংসাহিত্যামোদী ভক্তবৃন্দের পংক্তিতে পংক্তিতে
অপরিম্যাপ্ত পরিবেশিত !

সে আবার কি ?

স্বামী-তীর্থ

যত ইচ্ছা, এ সাহিত্য-মহাম্মত
পান করিয়া যুগে যুগে অমর হইয়া থাকুন, কিন্তু সাবধান,
এ অম্মত ঘেন মাটিতে না পড়ে !

—কাল—

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন
ভট্টাচার্যের পর—উপন্যাস-সাহিত্য-ক্ষেত্রে “স্বামীতীর্থের” উপমা—
‘গঙ্গাজলে’ গঙ্গাপূজার মত কেবল ‘স্বামীতীর্থ’ উপন্যাস পাঠেই হইবে,
নচেৎ, কথার শক্তি নাই, বুঝাতে ইহায় !

হিন্দু মাত্রেয়ই “স্বামীতীর্থ” পাঠের একান্ত প্রয়োজন হইলেও
পরমা খরচ করিতে নারাজ—অথচ পাঠেছা-প্রবল সাহিত্যামোদীগণ,
স্থানীর লাইব্রেরী হইতে চাহিয়া লইয়াও একবার পড়িবেন,
ইহাই প্রকাশকের বিনীত অনুরোধ। ভারতের সমস্ত পুস্তকালয়ে
প্রাপ্য।

নির্মল-সাহিত্য-পীঠের নূতন গ্রন্থ
স্নেহ ও স্নেহ সিন্ধু !

— প্রথম গ্রন্থ —

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্রের

হিন্দু-নারী

জাহ্নবী-বসুনার মত ছ'টি চক্ষুর স্রীতিধারায় বইখানির লেখা শেষ হইয়াছে। আরম্ভের দিকের পরিচরে গ্রন্থকর্ত্রী সুলেখিকা শ্রীযুক্তা চারুশীলা মিত্র মহোদয়ার নামই আড়ম্বরপূর্ণ অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা অধিক কাজ করিবে, আর এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ও মধ্যভাগের রচনা-কৌশল পড়িয়া পাঠকপাঠিকা, বলুন ত, এই ধরণের উপভাস আপনি মোট ক'খানি পড়িবার সুযোগ জীবনে পাইয়াছেন ? মহিলা-সাহিত্যের পর্দানসীন-আসরে এই গ্রন্থকর্ত্রীর আসন আপনারা কোথায় নির্দেশ করিলেন, পাঠান্তে “হিন্দু-নারীর” প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে সরল সত্য কথার “নির্মল-সাহিত্য-পীঠে” জানাইতে হইবে, এইটুকুই আপনাদের নিকট প্রকাশকের বিনীত অজুরোধ ! ইতিমধ্যেই হিমালয় হইতে কুমারীকা পর্যন্ত এই বইখানির নাম সকলের মুখস্থ হইয়া গিয়াছে—

হিন্দু-নারী !

হিন্দু-নারী !!

রোমাঞ্চকর ডিটেক্টিভ উপন্যাস—‘মিলন-রাত্রি !’

মহিলা-মনোহারিনী সুলেখিকা

শ্রীমতী কমলাবালা দেবী বিরচিত

মিলন-রাত্রি

মহিলা-মনোমন্দিরে—মন্দিরা-মন্ড্রে—মোহন-সুন্দরে
সুন্দরী মোহিনী মিলনের এক রাত্রি ;—

মিলন-রাত্রি

এ ফুল-নিশীথে—ধরি হাতে হাতে—জীবনের পথে
মিলিয়া—মিশিরা স্তম্ভী হও ! জাননা ?—এ যে মিলন-পূদিমা !

‘বুঝি এমনি নিশীথে সেই’রে,
প্রথম প্রণয়ী ধরে প্রিয়া কর,
প্রথম পিকের আগে কুহ স্বর
প্রথম বাণীর রাখা রাখা স্বর
কক-কুটীরে ফুকারে !’

কে কোথায় আছ, মিলন-রাত্রির আনন্দ-বাজী, এ শুভ যাত্রায়
সাথী হও ! আমরা শুভ-মিলনের চাক-কুলতরী খুলিরা নিরাছি,—

আর বিলম্বে কাজ কি ?

দীর্ঘ বিরহের পর মিলনানন্দের আরামপ্রদস্থানে শরীর রোমাঞ্চ
হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল উপন্যাসের পৃষ্ঠা—মোখীন
গোয়েন্দার বিভীষিকাময়ী বন্দী-বন্ধনে—পাঠকের মগজের রক্ত
চল্কাইয়া দিবে—এমনি/লেখিকার লিপি-চাতুৰ্য্য !!

